দাম ঃ ছয় টাকা

স্বস্তিকা

প্রজাতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা - ২৪ জানুয়ারি, ২০১১

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ● ৭

কাশ্মীরের সারস্বত চর্চা ❖ নবকুমার ভট্টাচার্য ● ৯

কাশ্মীর সমস্যার জন্য দায়ী জওহরলাল নেহরু ❖
ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ● ১৩

কাশ্মীর রক্ষা আন্দোলনের একটি পর্যায় ❖
বাসুদেব পাল ● ১৯

কাশ্মীর ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ❖
মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) ● ৩২

কাশ্মীর ও নেহরু হ্ল অপকীর্তির এক নিদর্শন ❖
তথাগত রায় ● ২৭

সন্ত্রাস ও মৌলবাদ ❖ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ● ৩১

কাশ্মীরী জঙ্গিদের পুনর্বাসন ❖ তারক সাহা ● ৩৫

।। দাম ৬ টাকা।।

স্বস্তিকা

প্রজাতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা

৬৩ বর্ষ ১৯ সংখ্যা,
৯ মাঘ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১২
২৪ জানুয়ারি - ২০১১

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ

দার্শনিক প্লেটো একবার বলিয়াছিলেন, যাহা কিছু মহান তাহাকে ঘিরিয়াই সব বিতর্ক হয়। আর সেই বিতর্কই মহান, যাহার কোনও সমাধান নাই। জওহরলাল নেহরুর চূড়ান্ত অপদার্থতার জন্যই এই মহান তত্ত্বের উদাহরণ হিসাবে আমরা অবশ্যই কাশ্মীর সমস্যার কথা উল্লেখ করিতে পারি। ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরের জন্মলগ্ন হইতেই বিতর্ক ধাওয়া করিয়া চলিতেছে। নেহরু ও মাউন্টব্যাটেন এই সমস্যা সৃষ্টির মূলে। কাশ্মীর লইয়া মাউন্টব্যাটেন বৃটিশের স্বার্থরক্ষা করিয়াছেন, আর পরপর ভুল করিয়া গিয়াছেন জওহরলাল নেহরু। নেহরু কাশ্মীরের মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ওই রাজ্যের ভারতভুক্তির পরেও তাহাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছেন। কিন্তু কাশ্মীরকে বিশেষ ধরনের মর্যাদা দেওয়ার ফলে বারবার মনে হইতেছে—কাশ্মীর আলাদা রাষ্ট্র। পাকিস্তান এই অদ্ভুত ব্যবস্থাটাকেই কাজে লাগাইয়াছে। কাশ্মীরে সেকুলারিজমের দোহাই দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি পরম্পরা ও জাতীয়তাবাদকে অপাঙতেয় করিয়া রাখা হইয়াছে। এমনকী কাশ্মীরে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনেও আপত্তি করিয়াছেন কোনও কোনও মহল। পাকিস্তানের শেখানো বুলি আজ শুধু কাশ্মীরী উগ্রবাদীদের কণ্ঠে নয়, অনেক ভারতীয় বুদ্ধি জীবীও সেই দাবিতেই গলা মিলাইতেছেন। তাহাদের দাবিটা চিন্তা করিবার বিষয়। কারণ ইহা একটি অশনিসঙ্কেত। দাবিটা হইল—পৃথক রাজ্য নয়— একটা স্বাধীন দেশের রাজ্যকে ভাঙিয়া অন্য একটি দেশে মিশাইয়া দিবার দাবি অর্থাৎ একটি স্বাধীন দেশের সম্পূর্ণ রাজ্যটাকে অন্য একটি রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিবার দাবি। ইহা তো ভারতবর্ষের মতো একটা সনাতনী দেশ ও জাতির দুইশত বৎসরের স্বাধীনতার সংগ্রামকে অপমান করা। কাশ্মীরে সন্ত্রাসের মদতদাতা হিসাবে পাকিস্তানকে যখন চিহ্নিত করা গিয়াছেই তখন পাকিস্তানের প্ররোচনায় জঙ্গিদের 'বিপ্লবী' 'আজাদি' বলিয়া স্তাবকতা করা কেন? কেন্দ্রীয় সরকার রাশি রাশি টাকা কাশ্মীরের জন্য ব্যয় করিতেছেন অথচ সেই টাকা উন্নয়নের জন্য ব্যয় না হইয়া উগ্রবাদীদের পকেট ভরিতেছে। কাশ্মীরের প্রকৃত উন্নয়ন করিতে হইলে কঠোর হাতে জঙ্গিদমন প্রয়োজন। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অথচ অমরনাথ যাত্রার পূর্বে নিরীহ তীর্থযাত্রীদের বারবার ভাবিতে হয় প্রাণ হাতে করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিতে পারিবেন কিনা। ইহা প্রকৃতই লজ্জার। বছরের পর বছর ধরিয়া মার খাইতেছে ভূ-স্বর্গের পর্যটন শিল্প। সেখানে দিগন্ত বিস্তৃত ভূমি রহিয়াছে কিন্তু আজ স্বর্গ নেই। কাশ্মীরের নাম শুনিলেই পর্যটকদের চোখের সামনে এখন ভাসিয়া ওঠে রক্তের বন্যা। স্রেফ পর্যটককে ভরসা করিয়াই হইতে পারে কাশ্মীরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কাশ্মীরের সমস্ত সৃজনশীল কর্মকে আজ ধ্বংস করা হইয়াছে। তবুও একটি কথা আজ পরিস্কার করিয়া বলিবার প্রয়োজন—প্রত্যহ জঙ্গি অনুপ্রবেশ, হামলা এবং হিন্দু নিধন চলিতে থাকিলেও কাশ্মীর কোনওদিন পাকিস্তানের হইবে না। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অতীতে ছিল, আজও রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবে। নিজের প্রাণ দিয়া তাহা নিশ্চি ত করিয়া গিয়াছেন যে মহামানব, তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার প্রদর্শিত পথই আমাদের পথ।

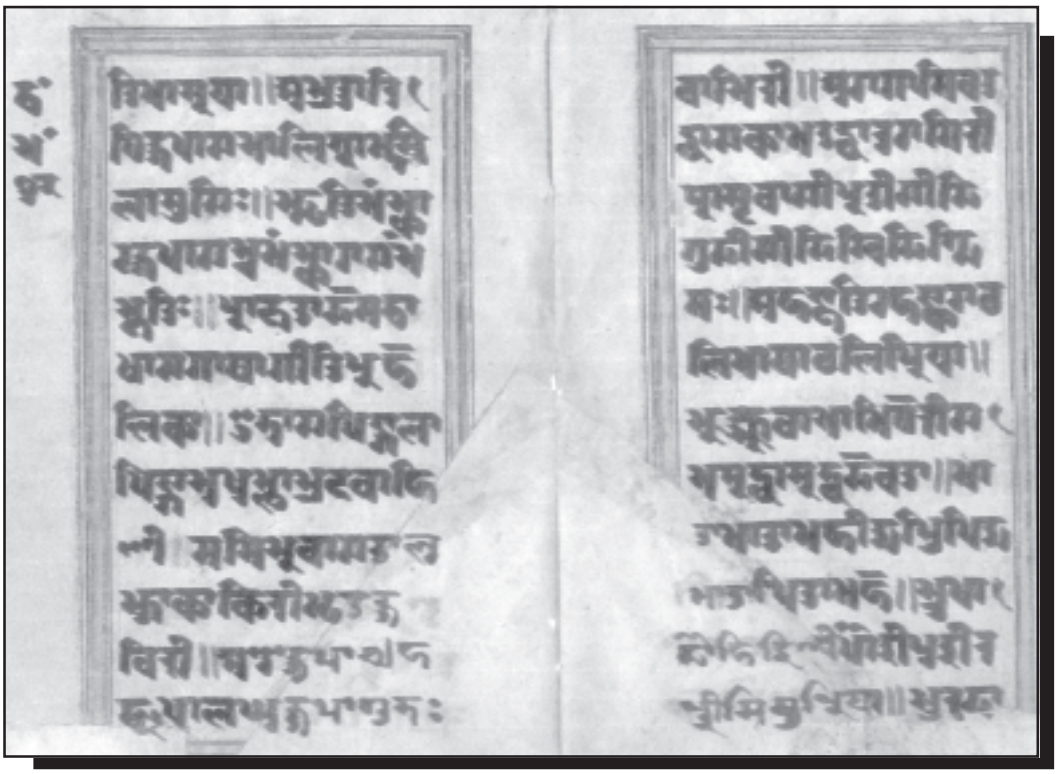

সারদালিপিতে অনাবিষ্কৃত একটি পুঁথির পাতা।

কাশ্মীরের সারস্বত চর্চা

নবকুমার ভট্টাচার্য

সারস্বত চর্চায় কাশ্মীরের অবদান ছিল বহুমুখী। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ভেষজ বিদ্যা, পুরাণ, দর্শন প্রমুখ বিষয়ে কাশ্মীরের স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। কাব্যের অলঙ্কার, রীতি, রস, ধ্বনি, বক্রোক্তি ও ঔচিত্য—এসব বিষয়েরই উৎসভূমি কাশ্মীর। অনেকেই হয়তো জানেন না পাণিনি ব্যাকরণের উপর কাশিকের অষ্ট্যাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য এখানে রচিত হয়েছিল। মহর্ষি চরকও কাশ্মীরের লোক ছিলেন, যিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা। কাতন্ত্র ব্যাকরণ কাশ্মীরের নিজস্ব ব্যাকরণ। এখানে শিবপুরাণেরও উৎপত্তি হয়েছিল।

নীলমত পুরাণ কবি কল্‌হণের রচিত। নীলমত পুরাণের রচনাকাল ষষ্ঠ শতাব্দীতে। নীলমত পুরাণে কাশ্মীরের পবিত্রস্থান সমূহের বর্ণনা রয়েছে। এই পুরাণে বহু কাহিনী রয়েছে যেগুলি রাজতরঙ্গিনী ব্যাখ্যার সহায়ক। নীলমত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে কাশ্মীরের সর্বসাধারণের জীবনযাত্রা, খাদ্য, পানীয়, পোষাক, পরিচ্ছদের বিষয়, তাঁদের আমোদ-প্রমোদ, ধর্মীয় চিন্তা ভাবনার প্রসঙ্গ। কাশ্মীরের লোকেরা সুপ্রাচীনকালে যে সমস্ত যজ্ঞ, ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব পালন করতেন তার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের প্রায় মিল ছিল। পরিভাষা বিষয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে চিরকালই কাশ্মীরের সামঞ্জস্য ছিল। সেখানে প্রবাহিত বিতস্থা সিন্ধুপ্রয়াগ নামে খ্যাত। কাশ্মীরের তীর্থ সরস্বতী, ঋষিকুল্য, রামহ্রদ, ভৃগুতুঙ্গ, চিত্রকূট, ভরতগিরি যেগুলি সারা ভারতের তীর্থক্ষেত্র।

কাশ্মীরের দক্ষিণাংশে (জম্মুর কাছাকাছি স্থানে) পঞ্চ ম শতকের শেষ ভাগে রচিত হয়েছিল বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ। এই গ্রন্থ একটা

বিশ্বকোষ। এতে আলোচিত হয়েছে সৃষ্টিক্রম, সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, ধর্ম, ভেষজবিদ্যা, কৃষি, কলা, স্থাপত্য। পশু জনন ও পালন, রাজনীতির মতো বিষয়গুলি। এই পুরাণ তিনটি খণ্ডে ৮৭ অধ্যায়ে লেখা। এই গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে অনিরুদ্ধের পুত্র কৃষ্ণের পৌত্র ব্রজের অনুরোধে। তিনি ঋষিদের থেকে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। তাঁরা মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করলেন। মার্কণ্ডেয় বলতে আরম্ভ করলেন কিভাবে বিষ্ণুর বরাহ অবতার জল থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তারপর বর্ণনা করলেন মহাজাগতিকচক্রে দেবতা, দৈত্য মানব সৃষ্টির রহস্য। দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে রাজনীতি। রাজার, রাণীর, মন্ত্রীর, সৈনিকের কর্তব্য সম্পর্কে এই খণ্ডে বলা হয়েছে। তাছাড়া বিচার ব্যবস্থা, চতুর্বর্গের কর্তব্য, আশ্রম ও পুরুষার্থ এখানে বর্ণিত। তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের কলা। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, পটশিল্প, তুলি শিল্প। নানা ধরণের স্থাপত্যের বিশদ বর্ণনা। এখানে ১০১ রকমের মন্দিরের কথা বর্ণিত হয়েছে। হংসগীত ও শঙ্করগীত এই পুরাণের অংশ বিশেষ। এই বিষয়গুলির কাশ্মীরের দক্ষিণাংশের, যে ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিদ্যমান। কাশ্মীরের দক্ষিণাংশে পুরাণটি একসময় রচিত হয়েছিল তা আজ সমগ্র ভারতে জনপ্রিয়। যা শিবপুরাণ নামে খ্যাত।

কাশ্মীরের অপর একটি জনপ্রিয় পুরাণ হলো বাসুকিপুরাণ যা নাগপুরাণ নামে খ্যাত। এই পুরাণে শিবপার্বতীর কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে পবিত্র স্থান, নদী, পাহাড় প্রভৃতির কথা। এর মধ্যে কবিতা রয়েছে ৫০১ টি। এখানে জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনী সম্ভবত শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ' নাটক থেকে সংগৃহীত। এই পুরাণের রচনাকাল সম্ভবত সপ্তম শতকে। এই নাগধর্মীয় পদ্ধতি এখানে বিশেষ সমাদৃত। এর থেকে বাসুকী কুণ্ড ও বাসুকী মণ্ডলের অন্তর্গত বহুতীর্থের নাম জানা যায়। এই পুরাণে গঙ্গা, ভাগীরথী, জাহ্নবী মন্দাকিনী, শ্বেতগঙ্গা, অতুলগঙ্গা প্রভৃতির নাম জানা যায়। কল্‌হণের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে বহু কবির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সমস্ত কবিরা কেবলমাত্র রাজপ্রাসাদের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তাঁদের কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের বর্ণনা। এই সময় যে সমস্ত কবি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দামোদর গুপ্ত, মনোরথ, শঙ্খ দত্ত, সন্ধিমত উল্লেখ্য। এই সময় অন্যতম রাজা ছিলেন জয়পীড়। তাঁর রাজত্বের কবিদের মধ্যে দামোদর গুপ্তের কুট্টনীমত কাব্যখানি আমাদের কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এই রচনাটি ছিল রোমান্সময়-বিদ্রুপাত্মক নীতিগর্ভ উপাদানে সমৃদ্ধ। এর মধ্যে মূল কাহিনীটি ছিল— এক যুবতী বারবণিতা একজন খল স্বভাবা বৃদ্ধা নারীর কাছে উপদেশ প্রার্থিনী। কেমন করে বিলাস ও নৈতিক অবধানতা সমাজকে কুক্ষিগত করেছে এটা তার একটা ছবি। অপরপক্ষে কবি ভল্লাটের 'ভল্লাটশতক' নামে ১০৮ শ্লোকের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে। এই গ্রন্থও বিদ্রূপাত্মক ও নীতিগর্ভের সংমিশ্রণ। রাজতরঙ্গিনীতেই দেখা যায় রাজা শঙ্কর বর্মা খুব অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের উপর অধিক রাজস্ব চাপিয়ে ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ভল্লাটের ন্যায় সুকবিও অতিকষ্টে কালাতিপাত করেছিলেন। যদিও 'ভল্লাটশতক' লেখা হয়েছিল রাজা শঙ্কর বর্মার উত্তরাধিকারী অবন্তী বর্মার রাজত্বকালে। বিদ্রূপাত্মক রচনার ক্ষেত্রে কবি ক্ষেমেন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনার সংখ্যা প্রায় ৪০টি। এর মধ্যে ১৯টির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্রের একটি কাব্যের নাম 'দর্পদলন'। এটি ছিল বিদ্রূপাত্মক ও নীতিগর্ভ বিষয়ক। এই কাব্যটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে— কৃপণের ধন হৃদ্‌রোগের সমান। কারণ এই ধন অনন্তকালের জন্য কৃপণতা আনে। অবৈধ ধন লোকে সর্বসমক্ষে সাহসের সঙ্গে ব্যয় করতে পারে না। সেই জ্ঞান, জ্ঞান নয় যা চরিত্র গঠন করতে পারে না, সেই জ্ঞান জ্ঞান নয় যার দ্বারা সুবিচার হয় না। কবি সৌন্দর্যের গর্ব বিরোধী কারণ সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী, বার্দ্ধক্য তাকে হরণ করে। বীরত্ব অপরের মৃত্যুর কারণ, রক্ষার জন্য নয়। ঠিক তেমনি দান হলো প্রশংসনীয় যা অপরের দারিদ্র্য নষ্ট করে আর সর্বোৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হলো অপরের ভাল করা। ক্ষেমেন্দ্রের অপর রচনা হলো 'সেব্যসেবকোপদেশ'। এতে বর্ণিত হয়েছে প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের রূঢ় সম্পর্ক। 'কালবিলাস' নামক কাব্যটি ক্ষেমেন্দ্র ১০টি সর্গে লিখেছেন। এতে রয়েছে মানুষের বিভিন্ন রকমের প্রতারণা মূলক মনোবৃত্তি। কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'দেশোপদেশ' ও 'নর্মমাতা' কাব্যদ্বয়েও একই রীতি অনুকরণ করেছেন। সেখানেও কবি তাঁর সময়ের সমাজের অনাচার দুষ্ট লোকেদের দুষ্ট আচার আচরণ বর্ণনা করেছেন। শাসন ক্ষমতায় আসীন আধিকারিকদের অপকর্ম স্বচ্ছ ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

'অন্যোক্তিমুক্তালতা' নামে কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন হর্ষদেবের সভাকবি শম্ভু। বিভিন্ন ছন্দে লেখা এই কাব্যে কবি মানব জীবনের সুখ দুঃখের বর্ণনা করেছেন। কাশ্মীরের রাজসভার কবি ও কাব্য সম্পর্কে যা জানতে পারা যায় সেগুলি হল, শিবস্বামীর কাপহিনাভ্যুদয়, রত্নাকরের হরবিজয়', ভীমের রাবণার্জুনীয়, সঙ্ঘের 'শ্রীকণ্ঠচরিত' এবং শ্রীবরার 'কথাকৌতুক'। শিবস্বামী ছিলেন রাজা অবন্তীবর্মার সভাকবি। রাজা জয়সিংহের কালে কবি সঙ্ঘ তাঁর 'শ্রীকণ্ঠ চরিত' কাব্যখানি লিখেছিলেন।

কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিনী' কাশ্মীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কারণ এই গ্রন্থকে ইতিহাস বলে স্বীকার করা হয়েছে। কাশ্মীর রাজ হর্ষের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন চমক তনয় (১০৮৯-১১০০) কল্‌হণ তাঁর গ্রন্থে সেকালের রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও ভাগ্যান্বেষনোন্মুখতার কথা উল্লেখ করেছেন। কল্‌হণের ছিল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তিনি বংশানুক্রমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচনায় সর্বধর্মের সর্বজনীনত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি একজন প্রকৃত ঐতিহাসিক ছিলেন।

ঈশ্বরভক্তিমূলক কবিতার ক্ষেত্রে কাশ্মীরের সুপরিচিত কবির বহু লেখা পাওয়া গেছে। যেমন আনন্দবর্ধনের 'দেবীশতক' জগদ্ধরের 'স্তুতিকুসুমাঞ্জলি'। কল্‌হণের 'অর্ধনারীশ্বর স্তোত্র' হলো শিবপার্বতীর যৌথ স্তোত্র। সর্বজ্ঞমিত্রের 'স্রগ্ধরা স্তোত্র' হলো বৌদ্ধ দেবী তারার স্তুতি। অবতারের 'ঈশ্বর শতক' এবং সাহিব কৌলের 'দেবী নাম বিলাস' ও পাওয়া গেছে। বহু ভক্তিমূলক কাব্য এখনও অপ্রকাশিত বা নষ্ট

হয়ে গেছে। যেমন রত্নকণ্ঠের 'রত্নশতক' যাতে সূর্যের ত্রিকালীন রূপ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে কাশ্মীরের অবদান সশ্রদ্ধ স্মরণীয়। কাশ্মীরীয় বিদ্বান ভামহ অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ব্যক্তি। তাঁর কাল মহামুনি ভরতের পর। ভামহই প্রথম যিনি কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'। ইনিই প্রথম গুণের সংখ্যা দশ থেকে তিন এ এনেছেন (মাধুর্য, ওজঃ প্রসাদ)। ভামহই প্রথম বক্রোক্তির গুরুত্ব নির্ণয় করেছেন, পরে কুন্তক শাখা বের করেছেন যা 'বক্রোক্তি জীবিতম্' নামে পরিচিত। কাশ্মীর রাজ জয়পীড়ের রাজ্যের সভাকবি উদ্ভট ভামহের লেখার উপর সমালোচনা করে লিখেছেন 'অলঙ্কার সংগ্রহ'। তিনি নির্ণয় করেছেন ৪১ প্রকার কাব্যের রকম। উদ্ভটের সমসাময়িক বামন লিখেছেন 'কাব্যালংকার সূত্র'। তিনি বলেছেন রীতি হলো কাব্যের আত্মা। শঙ্কু 'রসের' উপর সমালোচনা করেছিলেন। এসবই কাব্য সমালোচনার রসধারার অন্তর্গত পূর্বের 'উৎপত্তিবাদ' এবং পরের 'অনুমিতিবাদ'।

আনন্দবর্ধন, রুদ্রট, মুকুল, ইন্দুরাজ এই চারজন আলঙ্কারিক অবন্তীবর্মার রাজত্বকালকে আলোকিত করেছিলেন। ভামহের আবিস্কৃত অলঙ্কারের সহায়ক ছিলেন ইন্দুরাজ।

মুকুল তাঁর 'অভিধাবৃত্তিমাতৃকা' শীর্ষক গ্রন্থে অভিধার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। আর আনন্দবর্ধনের মহান কীর্তি হলো 'ধ্বন্যালোক'। তিনি এই গ্রন্থে কতকগুলি কারিকার উপর সমালোচনাত্মক আলোচনা করেছেন। তিনি ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন। এই ধ্বনি তত্ত্বকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেলেন ধ্বন্যালোকের টীকাকার অভিনব গুপ্ত। আচার্য মম্মট এই ধ্বনি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আনন্দ বর্ধনের পরে এবং অভিনব গুপ্তের পূর্বে ছিলেন ভট্টনায়ক ও মহিমভট্ট। কুন্তক ছিলেন 'বক্রোক্তি'র প্রবক্তা। তিনি মহিমভট্টের পূর্বসূরী। তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন ধ্বনি ও রসকে বক্রোক্তির অন্তর্ভুক্ত করতে। কবি ক্ষেমেন্দ্র কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে 'ঔচিত্য' বাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে, ঔচিত্য কাব্যের আত্মা হিসেবে রসের অপরিহার্য অঙ্গ। এঁরা সকলেই কাশ্মীরের লোক। কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচক ছিলেন মম্মট। তিনি কমপক্ষে ৭৫টি ভাষ্য লিখেছেন। তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থ কাব্য সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার মাত্র। বস্তুত দণ্ডী, ভোজরাজ আর রাজশেখর ছাড়া সমস্ত প্রথিতযশা কাব্য সমালোচক জন্মেছিলেন কাশ্মীরেই।

দর্শন চর্চায়ও কাশ্মীরের এক স্বতন্ত্র ধারা ছিল। সেই ধারাটি বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। মাধবাচার্য যাকে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বলেছেন। 'ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা' নামক গ্রন্থে প্রত্যভিজ্ঞার সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এভাবে—অনাত্মবস্তু প্রতিকূল আত্মাভিমুখী যে জ্ঞান তাই প্রকাশ, তাই প্রত্যভিজ্ঞা—

কাশ্মীর ও আচার্য শঙ্কর

কলহন-প্রণীত কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'। এই ইতিহাস গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গে উল্লেখ আছে—"কাশ্মীরে ললিতাদিত্যের রাজত্বকালে (খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত) গৌড়দেশীয় পণ্ডিতগণ সারদা দর্শনের উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে প্রবেশ করে সকল দেবালয় বেষ্টন করেন"। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ওই দলে শঙ্কর ও তাঁর গৌড়দেশীয় শিষ্যগণ ছিলেন। মাধবাচার্যও তাঁহার গ্রন্থে শঙ্করের কাশ্মীরের সারদাপীঠে আগমন ও বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে বিচার এবং সারদাদেবী কর্তৃক শঙ্করকে সর্বজ্ঞ উপাধিভূষিত করিবার ঘটনাবলী অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

কাশ্মীরের ইতিহাস লেখা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য শুধু প্রাচীন কাশ্মীরের সহিত বর্তমান কাশ্মীরের তুলনা। যে সমস্ত আধুনিক পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন যে 'কাশ্মীরের অধিকাংশ প্রজা মুসলমান হইলেও রাজা ছিলেন হিন্দু'। তাহারা বলেন শুধু ডোগরা হিন্দু রাজা হরি সিংয়ের কথা;কলহন-বর্ণিত হিন্দু রাজা ললিতাদিত্যের কথা নয়। এই রাজার আমলেই আচার্য শঙ্কর কাশ্মীরে আগমন করিয়াছিলেন। শংকরাচার্যের আগমন নিঃশব্দে আগমন হয় নাই। তিনি শত শত শিষ্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধকের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্বত্র তাঁর বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন হইয়াছিল এবং সেখানকার অধিবাসিবৃন্দ দেবসম্মানে শঙ্করকে লইয়াছিলেন বরণ করিয়া। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে ক্রমে শঙ্কর আগমন করিলেন কাশ্মীরের অন্তর্গত 'সারদাপীঠে'। সমগ্র ভারতের বুধমণ্ডলী ও বিভিন্ন মতের সাধক ও পণ্ডিতগণ ওই স্থানে বাস করিয়া স্থানের মহিমা ও গৌরব বর্ধিত করিতেন।

সেই সময়কার কাশ্মীর যদি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং যেখানে বাস করিত সমগ্র ভারতের বুধমণ্ডলী এবং বিভিন্ন মতের সাধক ও পণ্ডিতগণ, তাহা হইলে কাশ্মীরের অধিকাংশ প্রজা কিভাবে মুসলমান হইলেন? অধিকাংশ প্রজা যে মুসলমান হইয়া গিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এ সত্য চিরকালীন নয়, সনাতনও নয়। তবে দুঃখজনক এবং ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাজনক তো বটেই। ইহার কারণ কী? কারণ হরেক। সে কারণগুলির মধ্যে প্রধানটিই বোধ হয় বলিয়া গিয়াছিলেন আচার্য শঙ্কর নিজেই তাঁহার 'সৌন্দর্যলহরী' বা 'আনন্দলহরী' স্তবে। এই স্তবটি তিনি রচনা করিয়াছিলেন বর্তমান কাশ্মীরের শ্রীনগরস্থিত শৈলোপরি শিবমন্দির ও দেবীদর্শনের সময়।

শঙ্করাচার্য একজন দুরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তিনি নিশ্চিত উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে সনাতন বৈদিক ধর্মের "...বহুধা বদন্তি" ভিত্তিক উদার মতামতের স্বাধীনতা একদিন এই ধর্মের প্রতি মানুষের আনুগত্য কমিয়া গিয়া বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক প্রভৃতি পন্থের সৃষ্টি হইয়া বৈদিক দেবতা শিবের শক্তি হরণ করিবে। আজ হিন্দুর দেবতা নানান ভাগে ভাগ হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। নিজের ধর্মের প্রতি আনুগত্যহীনতা আজ তাহাকে রাজনৈতিক আনুকুল্য হইতেও বঞ্চিত করিতেছে।

'প্রতীপমাত্মাভিমুখ্যেন জ্ঞানং প্রকাশঃ প্রত্যভিজ্ঞা'। সহজ কথায় বলা যায়, আমি ঈশ্বর, অন্য কেউ নয়, এই প্রকার যে সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভব তাই প্রত্যভিজ্ঞা। 'কৌলমার্গরহস্য' নামক গ্রন্থে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে অনুভব ও অনুভবমূলক জ্ঞান তিন প্রকার—অনুভব, স্মৃতি ও প্রত্যাভিজ্ঞা। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জন্য সম্যক্ জ্ঞানের নাম অনুভব বা প্রত্যক্ষ। কোনও বস্তু প্রত্যক্ষ করলে মনে তার বাসনা থাকে, এই বাসনার নাম সংস্কার। বস্তুর দর্শনাদিতে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হলে তার নাম স্মৃতি। আর পূর্বানুভূত বিষয়ের সংস্কার ও প্রত্যক্ষ উভয়ে মিলে যে জ্ঞান জন্মায় তাকেই বলে প্রত্যভিজ্ঞা।

যেমন পূর্বে একটি ঘট দেখেছিলাম, তার সংস্কার আমার অন্তঃকরণে রয়েছে। আবার একটি ঘট দেখে পূর্বে যে ঘটটি দেখেছিলাম এটি সেই ঘট এমনি জ্ঞান হয়—এর নামই প্রত্যভিজ্ঞা। অবিদ্যাবদ্ধ জীব নিজের শিবত্ব বিস্মৃত হয়ে অণুত্ব লাভ করে, পরে সাধনার দ্বারা অবিদ্যাপাশ ছিন্ন করে আবার শিবত্ব লাভ করে এবং 'সোহম্' আমি সেই শিব এই প্রত্যভিজ্ঞা লাভ হয়। এই প্রত্যভিজ্ঞা যে দর্শনের আলোচ্য বিষয় তাকে সংক্ষেপে ত্রিক বলা হয়। একে ষড়র্ধশাস্ত্রও বলে।

কাশ্মীর শৈব মতে দেবনাগরী বা সারদালিপি জ্ঞানের উদয়ক্রমের (পরামর্শদয়ক্রম) দ্যোতক। বর্ণমালার প্রথম দুটি স্বরবর্ণ অ আ ই ঈ উ ঊ যথাক্রমে পরমশিবোদ্ভূত অনুত্তরশক্তি, আনন্দশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ঈশনশক্তি, উন্মেষশক্তি এবং উর্মিশক্তির দ্যোতক। এদের মধ্যে দীর্ঘস্বর ত্রয় হ্রস্বস্বর শক্তিত্রয়ে লীন রয়েছে বলে এই দর্শনে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। অনুত্তর, ইচ্ছা এবং উন্মেষ এই তিন শক্তিকে ত্রিক বলা হয় এবং যথাক্রমে চিৎশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তিও বলা হয়। ত্রিক মত শিবাদ্বয়বাদ। এই মত আগমসম্মত ও অবৈদিক। এই মতে আবার সিদ্ধা, নামক এবং মালিনী এই তিনটি আগমগ্রন্থকে প্রামাণ্য বলে মনে করা হয়। এই দর্শন অনুসারে শিবের দুই রূপ—বিশ্বময় ও বিশ্বোত্তীর্ণ। তাই শিবকে বলা হয় সর্বাকৃতি ও নিরাকৃতি। সর্বাকৃতি বিশ্বময় ও নিরাকৃতি বিশ্বোত্তীর্ণ। শিব একই সময়ে কি করে বিশ্বময় ও বিশ্বোত্তীর্ণ হতে পারেন? কাশ্মীরী তান্ত্রিক আচার্য জয়রথ বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন দর্পণাদি থেকে ভিন্ন ঘটাদি বস্তু যেমন দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হলে দর্পণাদি থেকে অভিন্নরূপে প্রকাশমান হয় তেমনি শিবের ইচ্ছাবশতঃ তাঁর স্বরূপ থেকে ভিন্নরূপে তাঁরই স্বরূপে অবভাসিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব তাঁর স্বরূপ থেকে অভিন্নরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্যই তিনি বিশ্বময় হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বময়।

প্রত্যাভিজ্ঞা থেকে ভিন্ন কাশ্মীরের অপর একটি দার্শনিক প্রক্রিয়ার নাম ক্রমমত। যা বহু পূর্বে লুপ্ত হয়ে গেছে। যতদূর জানা যায় খৃস্ট সপ্তম শতকের শেষের দিকে বা অষ্টম শতকের প্রারম্ভে কাশ্মীরে এই মতের উদ্ভব হয়। এটি কাশ্মীরের অন্যতম প্রাচীন অদ্বৈত মত। এই মতের আদিগুরু শিবানন্দনাথ ওরফে অবতারনাথ।

শিবানন্দের তিন শিষ্যা—কেয়রবতী, মদনিকা ও কল্যাণিকা। এঁদের শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত তিনজন গোবিন্দরাজ, ভানুক ও এরক। আচার্য অভিনব গুপ্ত ক্রমমত সম্বন্ধে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন—ক্রমকেলি ক্রমস্তোত্র এবং দেহস্থ দেবতাচক্র স্তোত্র। ক্রমমতের দুই ধারা—এক সম্প্রদায় অনুসারে শিব পরমেশ্বর। তিনি পরমসত্তা। অন্যমতে কালী পরমেশ্বরী। তিনিই পরমসত্তা। তবে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের শৈবই বলতেন। ক্রমমত পঞ্চ মকার নির্ভর। তন্ত্রোক্ত চক্রকল্পনা ক্রম মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্রমে মতে যোগ সাধনার নির্দেশ রয়েছে। তবে এ যোগ পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগ থেকে ভিন্ন। এটি ষড়ঙ্গ যোগ—প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক এবং সমাধি। এই মতে মুক্তির উপায়ও রয়েছে।

এইসব গ্রন্থ এবং গ্রন্থগুলির নানা ভাষ্যই কাশ্মীরের সারস্বত চর্চার উজ্জ্বল উদাহরণ। ●

কাশ্মীর সমস্যার জন্য দায়ী জওহরলাল নেহরু

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে এত লেখালেখি হয়েছে যে নতুন কিছু লিখতে গেলেই তা চর্বিতচর্বণের পর্যায়ে পড়ে। অপ্রিয় সত্য হলো, কাশ্মীর সমস্যার মূলে কিন্তু ভারত সরকার। সোজা ভাষায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। এই অবিসংবাদিত সত্য কথাটি বলতে অনেকেরই মুখে বাধে। হতে পারে তিনি ভারত আবিষ্কার করেছেন, বা বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ লিখেছেন, কিন্তু বাস্তব রাজনীতিতে তিনি যে দুগ্ধপোষ্য শিশু, তা তাঁর পরম বান্ধব-বান্ধবীরাও স্বীকার করবেন। সোজা বিষয়কে জট পাকাতে তাঁর মতো ওস্তাদ বিশ্ব রাজনীতিতে কদাচিৎ চোখে পড়ে। তাঁর ব্যক্তিগত রাগ অনুরাগ, বন্ধুপ্রীতি ও পরকীয়া প্রেমের শিকার হয়ে ভারতবাসী সমস্যার অগাধ-সলিলে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। তিনি সমস্যা পাকাতে যত ওস্তাদ, সমাধানে তত অক্ষম অপারগ। কাশ্মীর সমস্যা, তিববত সমস্যা, চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সবই তার অক্ষয় কীর্তি।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ এবং লেডি মাউন্টব্যানের প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ নেহরুকে তারা নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। এই দম্পতির অশুভ প্রভাবে নেহরুজী কাশ্মীরের ব্যাপারে একের পর এক ভুল পদক্ষেপ নিয়েছেন, আর রাষ্ট্রসঙ্ঘের ফাঁস পরেছেন।

পাকিস্তানী হানাদার এবং হানাদারবেশী পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করলে মহারাজা হরি সিং নিঃশর্তভাবে ভারতে যোগদানপত্রে সহি দেন; কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। ভারতের পক্ষ থেকে যোগদান পত্র গ্রহণ করেন গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

ব্যাপারটা একটু খট্‌কা লাগছে না! স্বাধীন ভারতের গভর্নর একজন বৃটিশ রাজপুরুষ! খট্‌কা লাগারই কথা। তা হলে একটু পেছনে তাকাতে হয়।

দেশটা তো ভাগ হলো। যারা ভাগ করল তারা তল্পিতল্পা গুটিয়ে করাচীতে পাড়ি দিল। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান, ছত্রভঙ্গ অবস্থা; কিন্তু গুছিয়ে বসে শাসনকার্য চালাতে তাদের কোনও বিদেশী গভর্নরের গার্জিয়ানীর দরকার হলো না। আর যাদের কূট চক্রান্তে দেশটা ভাগ হলো, সেই বৃটিশ রাজের প্রতিনিধিকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর হিসাবে রেখে দিয়ে তার কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে জওহরলাল নেহরুর তিলমাত্র বিবেকে বাধেনি। কু-লোকে বলে, ইতিমধ্যে বড়লাট পত্নী লেডী মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহরুজীর যে পরকীয়া প্রেমোন্মেষ ঘটেছে, তাকে অব্যাহত রাখতেই নেহরুজী শাসনকার্য পরিচালনায় অনভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে লাট-পত্নীর উষ্ণ সাহচর্য বজায় রেখেছেন।

এই অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি হলো ভয়ঙ্কর। কাশ্মীর যুদ্ধে জয়ের মুখে একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা, শত্রুকে বিতাড়িত না করে সমাদরে ঘরে রেখে যে কেউ রাষ্ট্রসঙ্ঘে নালিশ করতে ছোটে— এমন দৃষ্টান্ত দেখালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের নিগড়ে বাঁধা পড়লেন; আর ভারতকে বেঁধে রেখে গেলেন ইউ এন ও'র জিগড়ে। সেখানে আক্রান্ত ভারত আজ আসামীর কাঠগড়ায়; আর আক্রমণকারী পাকিস্তান ভারতের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে তর্জন-গর্জন করছে।

লেডি মাউন্টব্যাটেন ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। বিবাহিত জীবনেও তার পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল না। ভারতের বড়লাট-পত্নীর মতো গৌরব ও মর্যাদাপূর্ণ আসনে আসীন থেকেও তিনি তাঁর পুরনো অভ্যাস ছাড়েননি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু হলেন তাঁর প্রধান শিকার। মাউন্টব্যাটেন-কন্যা পামেলা মাউন্টব্যাটেন তার আত্মজীবনীতে লিখেছে— "মায়ের এই স্বভাব বাবা ভালোই জানতেন;কিন্তু প্রতিবাদ করতেন না।" তিনি ভারতের রাষ্ট্রনীতিতেও নাক গলিয়েছেন নেহরুর

দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। নেহরুকে চাপ দিয়ে অসময়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা, রাষ্ট্রসঙ্ঘে দরবার করতে ছোটা ইত্যাদি ক্ষতিকর সিদ্ধান্তে লেডি মাউন্টব্যাটেনের প্রভাব আছে বলে অনেক রাষ্ট্রনেতারই সন্দেহ রয়েছে। অন্যে পরে কা কথা— নেহরুর অকৃত্রিম বন্ধু মৌলানা আজাদও এই ধারণা পোষণ করতেন— বিশেষতঃ ভারত ভাগ সম্পর্কে নেহরুজীর মত পরিবর্তনে লেডি মাউন্টব্যাটেনের অশুভ প্রভাব কাজ করেছে বলে মৌলানা আজাদ খোলাখুলি মত প্রকাশ করেছেন ঃ

"আমি প্রায়শঃই বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি লর্ড মাউন্টব্যাটেন কিভাবে নেহরুকে জয় করলেন? তাঁর নীতিবোধ প্রবল, কিন্তু আবেগপ্রবণ এবং সহজেই ব্যক্তি-প্রভাবের বশবর্তী হন। আমার মনে হয় এই পরিবর্তনের একটি কারণ অবশ্যই লেডি মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিত্ব। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সখা-সুলভ প্রীতি ও অভিমানী স্বভাবের অধিকারিণী লেডি মাউন্টব্যাটেন ছিলেন সত্যিই মোহময়ী নারী।'

লেডি মাউন্টব্যানেটকে কাজে লাগিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে ভারত ভাগের কাজে লাগিয়েছেন বলে মৌলানা আজাদ মনে করেছেন। তিনি যে কাশ্মীর সম্পর্কে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণে নেহরুকে রাজী করাতে লেডিকে ব্যবহার করেননি সে গ্যারান্টি কে দেবে? "পিতার দৌলতে, গান্ধীর অনুগ্রহ, কপটতা, শঠতা ও ষড়যন্ত্র ছিল রাজনীতিতে নেহরুর মূলধন।" তিনি ছিলেন ক্ষমতালোভী, নীতিবোধশূন্য ও পরনারী আসক্ত। ভি. কে. কৃষ্ণমেনন তার সম্বন্ধে বলেছেন—"The P.M. (Nehru) is Keptman of Lady Mountbatten (M.O. Mathai– Reminiscences of the Nehru Age)."

এতো গেল নারীঘটিত ব্যাপার। এবার পুরুষঘটিত ব্যাপার দেখা যাক। নেহরুজীর 'জিগরী দোস্ত' ছিলেন শেখ আবদুল্লা। কাশ্মীরে মহারাজা হরি সিং-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের জন্য মহারাজ তাকে কারারুদ্ধ করেন। দুঃখে নেহরুর দিল্ ফেটে চৌচির। তিনি দোস্তের সঙ্গে মোলাকাত্ করতে কাশ্মীর যেতে চাইলেন; কিন্তু মহারাজ অনুমতি দিলেন না। নেহরুর ভীষণ গোঁসা হলো মহারাজার উপর। তখন বাগে পেয়ে তিনি মহারাজাকে শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন—বাস্তব পরিস্থিতি বিচার না করেই।

একথা ভুললে চলবে না যে কাশ্মীর একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য। মহারাজা হিন্দু, তিনি মুসলমানদের কোনও বদমায়েসী বরদাস্ত করতে নারাজ। কাশ্মীর আক্রান্ত হলে মহারাজার সৈন্যবাহিনীর মুসলমানরা পাকিস্তানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হিন্দু সৈন্য-সেনাপতিদের নির্বিচারে হত্যা করল। শ্রীনগরের দিকে

লেডি মাউন্টব্যাটনের সঙ্গে জওহরলাল।

এগিয়ে আসতে আসতে শহর ও গ্রামাঞ্চলের হিন্দুদের হত্যা করল, ঘরবাড়ি লুট করল ও আগুনে পোড়াল আর নারীদের উপর চলল অবাধ ধর্ষণ, অগণ্য অপহরণ।

এই পরিস্থিতিতে কাশ্মীরে মহারাজা হরি সিং-এর উপস্থিতি ছিল একান্ত অপরিহার্য—ভারত ও হিন্দুস্বার্থের প্রেক্ষিতে। কিন্তু বিপরীত বুদ্ধি নেহরু কি করলেন? তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শেখ আবদুল্লাকে শ্রীনগর পাঠালেন। হিন্দু প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন, গায়ের ঝালে মহারাজকে কাশ্মীর থেকে নির্বাসন করলেন। আর তার প্রাণের বন্ধুকে প্রধানমন্ত্রীপদে অভিষিক্ত করলেন।

শেখ আবদুল্লা গদিতে বসেই স্বমূর্তি ধারণ করেন এবং অসাম্প্রদায়িকতার জোববা ছুঁড়ে ফেলে সমগ্র প্রশাসনকে ইসলামীকরণে হাত দিলেন। মহারাজার স্থলে তার শিশুপুত্র করণ সিংকে গদিতে বসিয়ে আবদুল্লা একচ্ছত্র ইসলামী শাসন চালাতে লাগলেন। হিন্দুদের বাড়িজমি বাগান দখল করে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করলেন, সরকারি চাকরি থেকে হিন্দুদের বিতাড়ন করে শূন্যপদে মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করলেন। কাশ্মীরের হিন্দুরা পাকিস্তানী হিন্দুদের দশায় পড়ল। আবদুল্লা প্রশাসনের এই অসাম্য আচরণ ও বৈষম্যমূলক শাসনের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল প্রজাপরিষদ।

এদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ এবং লেডি মাউন্টব্যানের প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ নেহরুকে তারা নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। এই দম্পতির অশুভ প্রভাবে নেহরুজী কাশ্মীরের ব্যাপারে একের পর এক ভুল পদক্ষেপ নিয়েছেন, আর রাষ্ট্রসঙ্ঘের ফাঁস পরেছেন। আক্রমণকারীকে হঠাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হওয়ার মূর্খামির পর উপযাচক হয়ে গণভোটের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ হাতে নিজের গলায় দু'নম্বর ফাঁস পরেছেন।

এখানেই শেষ নয়। আবদুল্লাকে শাহানশাহ বানাতে কাশ্মীরের জন্য আলাদা বিধান, আলাদা প্রধান, ও আলাদা নিশান-এর ব্যবস্থা করে সংবিধানে ৩৭০ ধারা নামক এক আত্মঘাতী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বীজ পোঁতা হলো। ভারতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষে এক মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। তার ফলেই নির্বিরোধ নিষ্কন্টক কাশ্মীর আজ ভারতবাসীর গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে; গত ৬৪ বছর ধরে জাতির আর্থিক মেরুদণ্ডে ঘূণ ধরিয়ে দিয়েছে।

এর পরেও নেহরুজীকে বলতে হবে স্বাধীন ভারতের রূপকার? তার বিরুদ্ধ পক্ষ তাকে যে "Lotus-eater' from Kashmir" বলত, তা একেবারে অমূলক নয়। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে জাতির চরম সঙ্কটকালে জাতির পিতা ব্রহ্মচর্য পরীক্ষায় মত্ত;আর জাতির রূপকার পরকীয়া প্রেমে প্রমত্ত। দুর্বল চরিত্র জাতীয় নেতৃত্বের হাতে সৃষ্ট কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সূত্র তাই মিলছে না। ●

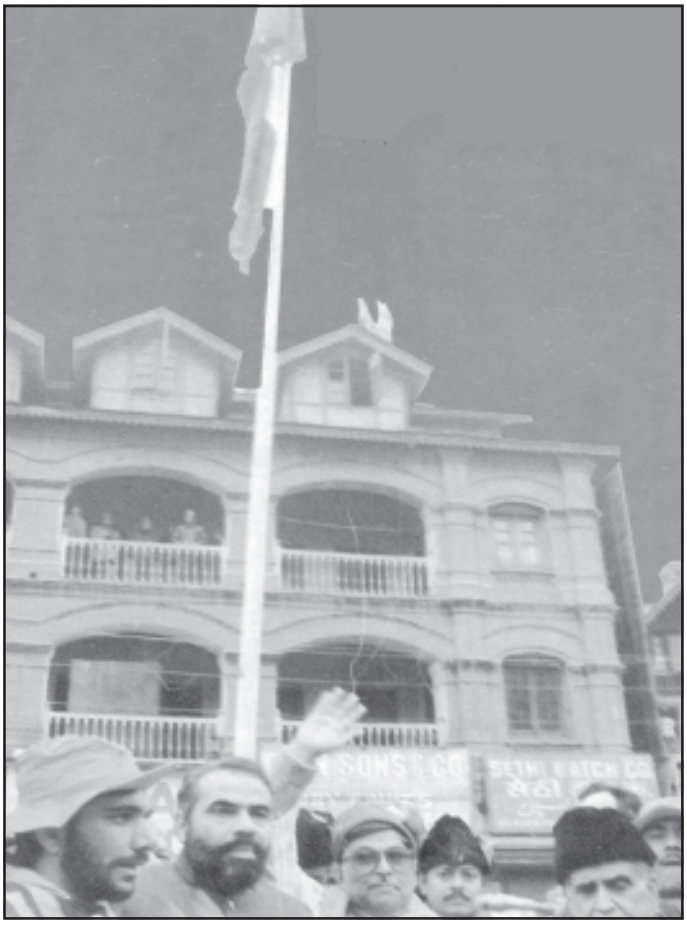

২৬ জানুয়ারি, ১৯৯২ - শ্রীনগরের লালচকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

কাশ্মীর রক্ষা আন্দোলনের একটি পর্যায়

বাসুদেব পাল

১৯৯২-এর ২৬ জানুয়ারি। সকাল ৯ টা। স্থান কাঁচড়াপাড়ার কাছে পিঁজরাপোল সোসাইটির বিশাল ময়দান। সামনে উপবিষ্ট প্রায় কুড়ি হাজার স্বয়ংসেবক। আর এস এসের পশ্চিমবঙ্গের শাখার তরুণদের শীতকালীন শিবির। প্রচণ্ড শীতেও সঙ্ঘের নির্দ্ধারিত গণবেশে (হাফপ্যান্ট ও সাদা সার্ট পরে) মাটিতেই তারা বসে আছে। হঠাৎ সঙ্ঘের সরকার্যবাহ মাননীয় এইচ ভি শেষাদ্রিজী একটি সুসংবাদ বিনা ভূমিকায় মঞ্চের মাইক থেকে ঘোষণা করলেন। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল উপস্থিত সবাই। কী সেই আনন্দ সংবাদ—"আজ আমাদের স্বয়ংসেবক ডঃ মুরলীমনোহর যোশী জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরের লালচকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন।" এই ঘটনাকে বিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু কেন?

কাশ্মীরে তিনরঙা জাতীয় পতাকা ঘটা করে তোলার কর্মসূচী একটা রাজনৈতিক দল কেন নেয়—এটা অবশ্যই ভেবে দেখার। ১৯৯২-এর জাতীয় পতাকা তোলার সময়কার দু'দিনের ঘটনাক্রম (২৫/২৬ জানুয়ারি) জানা গিয়েছিল ক'দিন পরে। শ্রীনগর থেকে কলকাতায় এক ঘরোয়া সভাতে বাংলার তিন বিজেপি নেতা যাঁরা ওই দু'দিনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাঁদের মুখ থেকেই। ওই তিনজন হলেন—পণ্ডিত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী (বর্তমানে প্রয়াত), প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন শিকদার ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনজনই কোনও না

কোনও সময়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

ডঃ মুরলী মনোহর যোশী তখন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি। সারা দেশেই সন্দেহ অবিশ্বাসের ভয়াল পরিবেশ। রক্ত ঝরছে জম্মু-কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে। মারা যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। নিরাপত্তা রক্ষী এবং সন্ত্রাসবাদীরাও। কাশ্মীরে পাকপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থীরা আর পাঞ্জাবে খালিস্তানপন্থী উগ্রপন্থীরা উন্মত্ত হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে প্রায় অবাধে। কাশ্মীর উপত্যকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পাক-প্রশিক্ষিত উগ্রপন্থীরা। পাঞ্জাবের মোগা ও গুরুদাসপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখার মাঠে এ কে ৪৭ রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে এক এক জায়গায় ২০/২৫ জন স্বয়ংসেবককে খালিস্থানী উগ্রপন্থীরা হত্যা করে। তখন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ছিলেন সদ্য প্রয়াত সিদ্ধার্থশংকর রায়। পরে তাঁকে কংগ্রেস আমেরিকায় রাজ্যপাল করে পাঠিয়ে দেয়। তখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় কংগ্রেস এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের তালা খোলার পর তার খানিক দায় গিয়ে পড়ে কাশ্মীর উপত্যকার নিরীহ সাধারণ হিন্দু পণ্ডিত পরিবারগুলোর উপর। তাদের উপর চরম অত্যাচার শুরু করে প্রতিবেশী মুসলমান ও তাদের সহচর পাকপন্থী ও পাকিস্তান প্রশিক্ষিত উগ্রপন্থীরা। হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন— মন্দির ধ্বংস, মেয়েদের উপর নির্যাতন (বলাৎকার, জোর-জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণ), অমরনাথ যাত্রীদের উপর হামলা, অবাধ সন্ত্রাস। হিন্দুরা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরি ছেড়ে শুধু প্রাণটুকু বাঁচাতে উপত্যকা ছেড়ে স্বদেশেই পরবাসী উদ্বাস্তুর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। দিল্লীর কংগ্রেস সরকার এবং শ্রীনগরের ফারুক আবদুল্লা (বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) সরকার পরোক্ষে উগ্রপন্থীদের মদত দিতে থাকে। কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদীদের পাশাপাশি তাদের সমর্থনকারী বিভিন্ন পাকপন্থী গোষ্ঠীগুলিও নানাভাবে ওইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজে মদত দিতে থাকে। এইসব গোষ্ঠীগুলির অন্যতম হলো—অল পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্স, জে কে এল এফ। এখানে একটি একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, 'হুরিয়ত'-দের দুটি গোষ্ঠী। একটি চরম পাকিস্তানপন্থী এবং অন্যটি সামান্য নরম। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বরাবর প্রতিযোগিতা পাক-ভজনায় কে কত বেশি তৎপর। নরমপন্থীরা যদি নয়াদিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান তো অন্যরা তখন দিল্লীস্থিত পাক-দূতাবাসে গিয়ে আই এস আই-এর কাছ থেকে দিশা-নির্দেশ নিয়ে ফেরেন। এ ঘটনা বারবার রাজধানীতে দেখা গিয়েছে। নয়াদিল্লীর দুর্বল নেতৃত্ব এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দুর্বল করতেই পারেনি। অন্য কথায় বলা যেতে পারে চেষ্টাই করেনি। এই সময়ে জম্মু-কাশ্মীরে ঠিকা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যাওয়া নিরীহ গরীব বিহার ও উত্তরপ্রদেশবাসীদেরকে নির্মমভাবে নির্বিচারে হত্যা করে পাক-মদতপুষ্ট এবং কেন্দ্রের নরম নীতির বলে বলীয়ান নৃশংস সন্ত্রাসবাদীরা। অনেক শিখপরিবারও প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাস করতেন। ১৯৪৭-এ কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দু জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ। ১৯৮৯ সালে তা নেমে আসে ৬ শতাংশে। ১৯৯১-এ ০.১ শতাংশে। বর্তমানে তাও নেই। ১৯৪৭ সালে মন্দিরের সংখ্যা ছিল ১৪০০ এবং মসজিদের সংখ্যা ছিল ২৫০০ টি। ১৯৯১-এ মসজিদের সংখ্যা বেড়ে হয় ১৫০০০ টি। ৬৬০ টি হিন্দু গ্রামের নাম বদলে মুসলমান নাম দিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে ১৫০০০ হিন্দু ঘরবাড়ি নির্বিচারে লুঠ করা হয়। অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে ৫৫০০০ ঘরবাড়ি হিন্দুরা উপত্যকায় ছেড়ে চলে আসেন। কংগ্রেস দল এখনও পর্যন্ত ওই হিন্দুদের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, দেখভাল বা পুনর্বাসনের কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি। যে সকল হিন্দুদের দোকানপাট ফেলে আসতে হিন্দুরা বাধ্য হয়েছে তার আনুমানিক মূল্য ৭০০০ কোটি টাকার উপর। হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে, ঘর-বাড়ি-মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে জম্মু-কাশ্মীরে নিহতের সংখ্যা প্রায় ৪৭ থেকে ৪৯ হাজারের মধ্যে। এর মধ্যে নিরাপত্তাবাহিনীর জওয়ানদের সংখ্যাটাই ১৩ থেকে ১৫ হাজার। বাদবাকী হতভাগ্য হিন্দু এবং দেশি-বিদেশী পাকিস্তান প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদী ও কাশ্মীরী মুসলমানরা। এরকম এক পরিস্থিতিতে ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে '৭৭ সালের পর দ্বিতীয়বার কেন্দ্রে অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় আসে। রামজন্মভূমিতে শিলান্যাসের সাফল্যের প্রাবল্যে বিজেপির ব্যাপক জয়লাভ সংসদীয় নির্বাচনে। দলের সাংসদ দুই থেকে বেড়ে হয় ৮৬ জন। বাম ও রামপন্থী বিজেপি'র সমর্থনে সরকার গড়ে জনতা দল। প্রধানমন্ত্রী হন কংগ্রেস (প্রাক্তন) নেতা বর্তমানে প্রয়াত বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। নির্বাচনের আগে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ইমাম বুখারির সঙ্গে এক বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই সম্ভবত কিছু ঠিক হয়ে থাকবে। যার ফলে মন্ত্রীসভা গঠিত হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন মুফতি মহম্মদ সৈয়দ। কিছুদিন পরই তার কন্যা রুবাইয়া কাশ্মীরী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে অপহৃতা হন। অপহরণকারীদের দাবীমতো পাঁচজন ধৃত কট্টর সন্ত্রাসবাদীকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে রুবাইয়া মুক্ত হয়। সাধারণ মানুষের চোখে এটা ছিল সাজানো নাটক বা গট-আপ। ১৯৯০ সালে অযোধ্যায় করসেবকদের উপর গুলিচালনার প্রতিবাদে বিজেপি সমর্থন প্রত্যাহার করলে ১৯৯১-এ মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়। নির্বাচনের মাঝে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তামিল সন্ত্রাসবাদীদের মানববোমা বিস্ফোরণে নিহত হন এবং পরে নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী হন। তখন ঘটে চরার-এ-শরীফ কাণ্ড। চরার-এ-শরীফ দরগা দখল করে পাকপন্থী সন্ত্রাসবাদী হামিদ গুল ও তার সঙ্গীসাথীরা। তাদেরকেও সরকারি অতিথির সম্মান-গোস্ত-বিরিয়ানিতে আপ্যায়িত করে সরকার ক্রমশঃ জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। এমনকী জম্মুর ডোডা, কিস্তবাড়, রাজৌরি, পুঞ্চ -এ কাশ্মীরী সন্ত্রাসবাদীদের হিন্দু হত্যালীলা নির্বিচারে ঘটতে থাকে। দেশের একতা, অখণ্ডতা, একাত্মতা প্রবল সংকটে পড়ে। তখনই ১৯৯১-এর ১১ নভেম্বর কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর একাত্মতা যাত্রা আরম্ভ করে ২৬ জানুয়ারি শ্রীনগরের লালচকে জাতীয় পতাকা তোলার কর্মসূচী নেন তৎকালীন বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি ডঃ মুরলীমনোহর যোশী। ২৫

জানুয়ারি বিশাল জনসভা হয় জম্মুতে। বাড়ি বাড়িতে লক্ষাধিক লোকের ২/৩ দিন থাকার ব্যবস্থা হয়। অটলজী, আদবানীজী সহ তাবৎ কেন্দ্রীয় নেতা জম্মুতে পৌঁছান। বলা বাহুল্য, এঁরা প্রায় সবাই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দেশের একাত্মতা ও অখণ্ডতা রক্ষার তাবৎ কর্মসূচীর মাধ্যমে ভারতবর্ষের অবিভাজ্য অঙ্গ হিসেবে কাশ্মীরকে রক্ষা করার ব্যাপারে সদা সক্রিয়। এখানেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা। ভারতীয় জনতা পার্টিকে বাদ দিলে সবই অরাজনৈতিক সংগঠন। প্রত্যেকে আলাদা করে কর্মসূচী নেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল পাকিস্তানকে আজাদ-কাশ্মীর (পাক অধিকৃত কাশ্মীর) উপঢৌকন দেবার পর বাদবাকী কাশ্মীরকেও পাকিস্তানের পায়ে প্রণামী দিতে চান। সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে সংকুচিত করে। কাশ্মীরের পাক-সীমান্ত থেকে সেনার সংখ্যা কমিয়ে, দেশে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাবী সমর্থন করে বক্তৃতা, সেমিনার করে, সেখানেই রুখে দাঁড়ায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। তা সে কলকাতা, দিল্লী, চণ্ডীগড় যেখানেই হোক না কেন। ১৯৯৯-এর ৩১ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী কাঠমাণ্ডু এয়ারপোর্টে বিনাবাধায় ঢুকে আই সি ৮১৪ ভারতীয় এয়ারলাইন্সের যাত্রীবাহী বিমান কব্জা করে। অপহরণ করে বিমানটিকে আফগানিস্তানের কান্দাহারে নিয়ে যাওয়া হয়। নববিহাহিত রূপেন কাটিয়ালকে উগ্রপন্থীরা ছুরি মেরে হত্যা করে তার স্ত্রীর সামনেই। দিল্লীতে বিমানযাত্রীদের আত্মীয়রা আন্দোলন শুরু করে। পরে অপহরণকারীদের দাবী মেনেই এন ডি এ সরকার মাসুদ আজহার সহ পাঁচ পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীকে জেল থেকে নিয়ে গিয়ে কান্দাহারে মুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়। মাসুদ পাকিস্তানে চলে যায়। তাঁকে সেখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। তারই প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নাম জৈশ-এ মহম্মদ। এরকম অন্ততঃপক্ষে শতাধিক সংগঠনের সন্ত্রাসবাদীরা সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে আজও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

এবার ডঃ মুরলীমনোহর যোশীর ১৯৯২-এর গণতন্ত্র দিবসের দিনের জাতীয় পতাকা তোলার ঘটনার কথায় আসা যাক। যোশীজীর

সঙ্ঘের কল্যাণী শিবিরে শেষাদ্রিজী (মাঝে), ডান দিকে সুদর্শনজী।

চাপের কাছে নতিস্বীকার করে কেন্দ্র সরকার। সরকারের অনুরোধ মেনে নেন বিজেপি নেতৃবৃন্দ। অটলজী জনতাকে শান্ত করেন। তিনি বলেন, এই নিয়ে (প্রথমবার ৫৩ সালেও শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গী ছিলেন বাজপেয়ীজী) দুবার তিনি জম্মু থেকে কাশ্মীর না গিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। সরকারের অনুরোধ মতো ১৮২ জন বিজেপি-র বাছাই করা কর্মকর্তাকে বিমানে শ্রীনগর উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ২৫ জানুয়ারি। বাংলা থেকে বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, তপন সিকদার ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুযোগ পান, পরে তাঁরা ফিরে যে বিবরণ দেন তা লোমহর্ষক। সেনা শিবিরে তাঁদেরকে রাখা হয়। সেনাবাহিনীর শিবিরে সেদিন সন্ধ্যায়ও বিস্ফোরণ ঘটে। সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল উগ্রপন্থীরা গুলি চালালে তবেই গুলি চালাতে পার— নইলে নয়। ওইদিন বিজেপি নেতারা যাওয়ার পর সেনাবাহিনীকে ফ্রি-হ্যাণ্ড দেওয়া হয়। তক্ষুণি ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ১৭ জন সন্ত্রাসবাদীকে মেরে তাদের মৃতদেহ নিয়ে আসে জওয়ানরা। বিজেপি নেতাদের পদার্পণে তাদের মনোবল বাড়ে, উৎসাহিত হন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য আগামীকাল জাতীয় পতাকা তোলার কর্মসূচী বাতিল হলে তারাও কাশ্মীর উপত্যকায় থাকতে পারতেন না। এবারও সেনাবাহিনী সরকারি নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের (সেনাবাহিনীর বিশেষ অধিকার আইন বাতিল) বিরোধিতা করেছে। এবারও সেইরকম উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উপত্যকায়। এগিয়ে এসেছে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। সর্বভারতীয় সভাপতি অনুরাগ ঠাকুর ডঃ শ্যামাপ্রসাদের কলকাতার মাটি থেকে বিশাল জনসভা ও শপথগ্রহণ করে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে রওনা হয়েছেন কলকাতা থেকে শ্রীনগর। ২৬ জানুয়ারি তিনি যুবকদের মধ্যে জাগরণ করে ১১ রাজ্য সড়কপথে পার করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন লালচকে। ভারতের একাত্মতা ও অখণ্ডতাকে বজায় রাখবেন প্রাণের বিনিময়েও হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সুপুত্র ও সাংসদ। বঙ্গবাসী ও দলের সর্বভারতীয় নেতা-নেত্রীরা তাঁকে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করেছেন।

কাশ্মীর ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ)

ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি মানুষই বিশ্বাস করেন জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একথা বলার কারণ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিশ্বমানবতার উন্নত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশ বিভাজনেও ব্রতী হয়েছেন।

অন্যদিকে ভারত বিভাজনের প্রথম দিন থেকেই কিছু রাষ্ট্র কাশ্মীর নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির আখড়ায় নেমে পড়েছিলেন। তখন শীতল যুদ্ধের সময়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র। বিপক্ষে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ। ভৌগোলিক দিক দিয়ে কাশ্মীরের উত্তরে ভারত সীমান্তে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মধ্য-এশিয়ার কিছু রাষ্ট্র এবং আফগানিস্তানের সীমান্ত এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। স্ট্রাটেজিকভাবে ওই অঞ্চল একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। মহারাজা হরি সিং-এর আমলেই ভারতের বৃটিশ সরকার ওই অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য থেকে ইজারা নিয়ে নিজেদের তত্ত্বাবধানে বৃটিশ অফিসারদের নজরদারিতে রেখেছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন আগে ওই অঞ্চল তারা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। যদিও মহারাজ

হরি সিং-এর অফিসারকে দায়িত্ব না দিয়ে পাকিস্তানের পতাকা তারা ওই অঞ্চলে উড়িয়ে দিয়েছিল। মনে হয়, তাদের ধারণায় ওই অঞ্চল পাকিস্তানের কর্তৃত্বে থাকলে, নবগঠিত রাষ্ট্রে তারা ওই অঞ্চলের নজরদারি চালিয়ে যেতে পারবে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে পণ্ডিত নেহরু যুদ্ধবিরতি করে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ওই সমস্যা নিয়ে গেলেন। বৃটিশ ও মার্কিন সরকার জানতেন, যে মুহূর্তে মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগদানের সনদে স্বাক্ষর করেছেন, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে। তথাপি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৪৭ নম্বর সিদ্ধান্ত যুক্তভাবে বেলজিয়াম, কানাডা, চীন, কলম্বিয়া, বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেশ করে এবং সুরক্ষা পরিষদে গৃহীত হয়। সুরক্ষা পরিষদের ২৮৬ তম ২১ এপ্রিল ১৯৪৮-এ অনুষ্ঠিত মিটিং-এ। (দলিল নম্বর এম/৭২৮, ২১ এপ্রিল ১৯৪৮) কারণ কাশ্মীর বিবাদ চলতে থাকলে বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব সুরক্ষা বিঘ্নিত হবে—এই অজুহাত। আজও সুর চড়িয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র বলছেন, বর্তমান বিশ্বে কাশ্মীর পরমাণু যুদ্ধের সূচনার বিন্দু হয়ে রয়েছে। সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে রাষ্ট্র সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় জনমত গ্রহণ করা হবে এবং তার ফলাফলেই জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে। কতকগুলি শর্ত উভয়পক্ষকে মানতে হবে যা পাকিস্তান আজও মানেনি। বলা হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। নিজে আইনজ্ঞ হয়ে এই বে-আইনি সিদ্ধান্ত তিনি কি ভাবে মেনে নিতে পারেন ধারণা করা সম্ভব নয়। তৎকালীন কাশ্মীরের মানুষ কট্টর ইসলামিক ছিলেন না বরং হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ সকলকে নিয়েই শান্তিপূর্ণ ভাবে এক সম্মিলিত সমাজে বসবাস করছিলেন। সেই তথ্যই বোধহয় পণ্ডিত নেহরুকে ওই সিদ্ধান্ত গ্রহণে শক্তি যুগিয়েছিল। কিন্তু এই সবের পিছনে "বিভাজন ও কর্তৃত্ব' স্ট্রাটেজি বৃটিশ সরকার খুব সফল ভাবেই প্রয়োগ করেছিল।

এরপর মঞ্চে আবির্ভূত হলো পাকিস্তান রাষ্ট্র। মার্কিন অস্ত্র নিয়ে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১-এ এবং কারগিলে আক্রমণ করে কাশ্মীর দখলে বিফল হয়েছিল। তারপর একদিকে ক্রমাগত জেহাদি আতঙ্কবাদী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, কাশ্মীরের নব যুবক-কিশোরদের অর্থের প্রলোভনে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে জেহাদি সন্ত্রাসবাদী তৈরি করে কাশ্মীরে গণ-বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রয়াস করছে, অন্যদিকে সংবাদ মাধ্যমকে ব্যবহার করে ভারত বিদ্বেষ ও কট্টর ইসলামিক মানসিকতা সৃষ্টি করে চলেছে। সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে খুব সুবিধে না হওয়ায়, এবার গণপ্রতিরোধের পথ বেছে নিয়ে সামরিক, সুরক্ষাকর্মী ও প্রশাসনের উপর প্রস্তর বৃষ্টির পথ নিয়েছে। একদিকে তারা আলোচনার বার্তা দিচ্ছে অন্যদিকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভারতবাসীর রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে। ১৯৭১-এর যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করায় তারা যে ভাবেই হোক কাশ্মীর দখল করে নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষতি পূরণের প্রতিজ্ঞা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবকিছু জেনেও না জানার অভিনয় করে চলেছে, কারণ আফগানিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানকে তাদের বড় প্রয়োজন। উইকিলিকস এবং ডেভিড কোলম্যান সবকিছু পাদপ্রদীপের সামনে এনে দিয়েছে।

চীনের সঙ্গে ভারতের একটাই সমস্যা। সীমান্ত কোথায়? তারা প্রায় সম্পূর্ণ অরুণাচল দাবী করেছে তিববতের অংশ হিসাবে চীনের ভূখণ্ড। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের মাধ্যমে ভারতকে দুর্বল করার কোনও সুযোগই নষ্ট করছে না। কাশ্মীর প্রশ্নে তারা পাকিস্তানের সমর্থক। পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সুরক্ষা চুক্তি, পরমাণু চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তারা সর্ব বিষয়ে পাকিস্তানের পাশে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে দশ হাজার চীনা সেনা নিয়োগের সুবিধা নিয়েছে, অজুহাত কারাকোরাম রাজ-সড়ক নির্মাণ। কাশ্মীরের এক অঞ্চল তারা চীনকে দান করেছে যা বস্তুতঃ ভারত -ভূখণ্ড। ভারতের বিরুদ্ধে চীন কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পাকিস্তানকে ব্যবহার করছে।

বিশ্বের ইসলামিক রাষ্ট্রের সংগঠন (অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক স্টেটস্) সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের হয়ে কাজ করছে। যেহেতু কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, কাশ্মীর পাকিস্তানের দিকেই যাওয়া উচিত, এটাই তাদের বক্তব্য। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস ভারতবর্ষে। ভারত ওই সংগঠনে প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী করায়, তা তারা নাকচ করে দিয়েছে, অর্থাৎ 'ও আই সি'তে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান সম্প্রদায় যোগদান করতে পারবে না। তাহলে ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা কি অযৌক্তিক? কিন্তু ভারত সঙ্গত কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই থাকতে চায়।

বাংলাদেশ মনে হয় বর্তমানে ওই ধর্মীয় কট্টরবাদীতার উর্ধ্বে উঠে স্বমহিমায় নিজ রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ এক কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায়। কাশ্মীর প্রশ্নে তারা নিরপেক্ষ। কিন্তু কট্টরপন্থীদের দাপট তাদের সহ্য করতেই হচ্ছে। চীন সেখানে পরমাণু চুল্লি নির্মাণ করে দেবে। অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে।

বিশ্বের প্রায় অন্য সমস্ত রাষ্ট্র বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছেন, কাশ্মীর সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষকে এই সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হবে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে উভয় পক্ষ মধ্যস্থতা করার কোনও প্রস্তাব দিলে অথবা অন্য কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহৃদয়তার সঙ্গে সেগুলি বিচার করবে। সাহায্য করবে।

বিগত দু-দশক যাবৎ যে ভাবে পাকিস্তান সরকার বিশেষ করে তাদের সামরিক বাহিনী এবং আই এস আই লস্কর-ই-তৈবা, জামাত-উল-দাওয়া, হিজুবল মুজাহিদিন, জয়েস-ই-মহম্মদ

ভারতে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু একটি বার্তাই দিয়েছে, তাদের কাছে কোনও প্রমাণ নেই। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আল কায়েদা, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেহাদি সন্ত্রাস পরিচালনা করছে তাদের নিকেশ করা। আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর রসদ পৌঁছানোর পথে যেন কোনও বাধা না আসে সেটাই নিশ্চিত করা। ভারতে কে মরল, কে বাঁচলো তাদের তেমন মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু উইকিলিকস সবই প্রকট করে দিয়েছে। সব জানা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ভারতের পীড়া বুঝতে চায়নি। বরং হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার দিয়ে এক বিফল সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অস্ত্রসম্ভারে তাকে শক্তিশালী করে রেখেছে। ভারতের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র বারংবার প্রয়োগ হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাতে কি আসে যায়। ৯/১১-র ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু ২৬/১১ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ওবামা

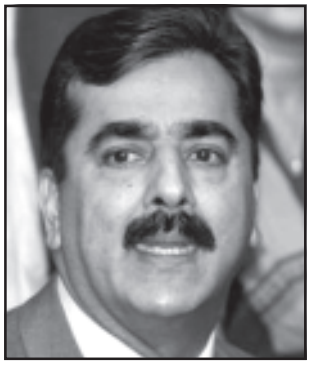

ইউসুফ রাজা গিলানি

হু জিন তাও

ভারতবর্ষের মানুষ তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্যায়ের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হবে। কাশ্মীর প্রশ্নে আইনগতভাবে পাকিস্তানের কোনও বিরোধিতার জায়গাই নেই। বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ইন্ডিপেনডেন্স অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট যদি মানা না হয়, তাহলে ভারত বিভাজন এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিই প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তবুও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র কাশ্মীর প্রশ্নে নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতিরে রাজনীতি করে চলেছেন। সময় এসেছে, ভারতকে কঠোরভাবে সেইসব রাষ্ট্রের মুখোশ খুলে দিতে হবে। আর যারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বিরোধিতা করছেন তাঁদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। অনেক হয়েছে, আর নরম মনোভাব দেখাবার জায়গা নেই। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি কাশ্মীর প্রশ্নে নিরপেক্ষতার অবস্থান গ্রহণ করেছে। কারণ তারা চাইবে না, তাদের রাষ্ট্রে আল কায়দা অথবা লস্কর সন্ত্রাসের তাণ্ডব আরম্ভ করে। ওই সব রাষ্ট্রগুলি চীনের আর্থিক বদান্যতায় বশীভূত এবং পাকিস্তানের বিরোধী মনোভাব চীন পছন্দ করবে না। অতএব নিজ নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থে তারা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করে। ওই সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল।

চীন মনে করে জম্মু-কাশ্মীর বিবাদিত ভূখণ্ড। কিন্তু পাকিস্তানের অধিকৃত কাশ্মীরে সড়ক তৈরি থেকে সমস্ত বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ভারতীয় কাশ্মীরের অধিবাসীদের ভিসা দেওয়ার ব্যাপারেও অনীহা প্রকাশ করেছে। চীন এবং পাকিস্তান প্রয়াস করছে কাশ্মীর প্রশ্নটিকে আন্তর্জাতিক সংঘাতের রূপ দেওয়ার। বিগত কয়েক সপ্তাহে সুরক্ষা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের প্রধানরা ভারত ভ্রমণে এসেছেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ছাড়া বাকী সকলেই পাকিস্তানী জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা সকলেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুরক্ষা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্য হিসাবে যোগদানের সমর্থন করেছেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী সমর্থনের কথা বলেননি। অনেকে বলবেন অন্য প্রধানমন্ত্রীরা ভারতের প্রতিরক্ষা এবং পরমাণু প্রকল্পের সওদা করতে এসেছিলেন।

মাঝে মাঝেই পাকিস্তানী সরকার হুংকার দিচ্ছেন, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে তারা পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না। এমতাবস্থায় বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ কি করবে? কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে বহু রাষ্ট্র নিজেদের স্ট্রাটেজিক স্বার্থের খাতিরে রাজনীতি করছেন। কিন্তু যে আইনের দৌলতে সম্পূর্ণ জম্মু-কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেই কথা কেন কেউই বলছেন না? ●

কাশ্মীর ও নেহরু অপকীর্তির এক নিদর্শন

তথাগত রায়

কাশ্মীর সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে কাশ্মীরের ভূগোলটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া ভালো, কারণ এই বাবদে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। যে ভূখণ্ডটি নিয়ে এত গণ্ডগোল তার পুরো নাম জম্মু ও কাশ্মীর। এর মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকা—যেখানে আমরা বেড়াতে যাই, শ্রীনগর, পাহালগাম ইত্যাদি যেখানে অবস্থিত—সেটি এই রাজ্যের একটি অংশ মাত্র। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মোটামুটি পাঁচটি ভৌগোলিক বিভাগ আছে—জম্মু অঞ্চল, কাশ্মীর উপত্যকা, হুনজা, স্কার্দু, বালতিস্তান এবং গিলগিট নিয়ে গঠিত তথাকথিত 'উত্তরাঞ্চল', লাদাখ এবং আকসাই চীন। এছাড়াও কারাকোরাম, পীরপঞ্জল এবং জাঁসকার পর্বতমালা সঙ্কুল অঞ্চল আছে, যা প্রায় জনমানবশূন্য। এর মধ্যে আকসাই চীন, যা বর্তমানে চীনের দখলে আছে, তাও জনমানবশূন্য এক বৃক্ষহীন তুষারাবৃত মরুপ্রান্তর। রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ বাস করেন জম্মু এবং কাশ্মীর অঞ্চলে।

জম্মু অঞ্চল টি ভারতীয় পাঞ্জাবের সংলগ্ন। এই অঞ্চলের মানুষের ভাষা 'ডোগরী', এঁদের ৬৬ শতাংশ মানুষ হিন্দু, ৩০ শতাংশ মুসলিম এবং ৪ শতাংশ শিখ। কাশ্মীর উপত্যকা, যার উত্তরে কারাকোরাম এবং দক্ষিণে পীরপঞ্জল পর্বতশ্রেণী, বর্তমানে প্রায় ৯৯ শতাংশ মুসলিম। এই অঞ্চলের পাঁচ শতাংশ অধিবাসী ছিলেন হিন্দু, যাঁদের সাধারণভাবে 'পণ্ডিত' বলা হয় এবং যাঁদের পদবী কৌল, রায়না, কাক, টিক্কু, ওয়াঁচু, জুৎশি প্রভৃতি। এই পাঁচ শতাংশ—প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ হিন্দু পণ্ডিতদের তাঁদের জন্মভিটে থেকে শুধু হিন্দু হবার অপরাধে নির্মমভাবে তাড়ানো হয়েছে এবং এঁরা বর্তমানে জম্মু শহর ও দিল্লীতে উদ্বাস্তু শিবিরে অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় বসবাস করেন। কিন্তু অল্পসংখ্যায় হলেও, কাশ্মীর উপত্যকায় কাশ্মীরীভাষী কাশ্মীরী মুসলমান এবং পণ্ডিত ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন। এঁদের মধ্যে আছেন গুজ্জর, পাহাড়ী এবং বকরওয়াল সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁরাও ধর্মে মুসলমান, কিন্তু এঁরা কাশ্মীরী ভাষা বলতে পারেন না এবং কাশ্মীরীদের সঙ্গে এঁদের বিশেষ ভাব-ভালবাসা বা আদানপ্রদানও নেই। লাদাখ অঞ্চলের মানুষ ৫২ শতাংশ বৌদ্ধ, ৪৮ শতাংশ শিয়া মুসলমান, যাঁদের সঙ্গেও কাশ্মীরী মুসলিম (যাঁদের সবাই সুন্নী)-দের কোনও সম্পর্ক নেই।

কাশ্মীর উপত্যকার অর্ধেকের কিছু কম অংশ পাকিস্তানের দখলে রয়েছে। এই অঞ্চলও প্রায় পুরোপুরি সুন্নী মুসলিম, তবে এঁদের মধ্যেও পাহাড়ী গুজ্জর ও বকরওয়াল সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন। এই অঞ্চল টি পাকিস্তানকে নেহরুর দান এবং এর সঙ্গে তিনি দান করেছিলেন 'উত্তরাঞ্চল'ও। এই উত্তরাঞ্চল (নর্দার্ন এরিয়াজ) নামটি পাকিস্তানীদের দেওয়া একটি বিস্তীর্ণ জনবিরল এলাকা—এর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু উপজাতীয় মানুষ বাস করেন। কিন্তু জিও-পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক-ভৌগোলিক দৃষ্টি থেকে এই অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অঞ্চল দিয়েই গিয়েছে বিখ্যাত কারাকোরাম হাইওয়ে, যার মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে সরাসরি চীনে যাওয়া যায়। জিয়াউল হক পাকিস্তানের শাসক থাকাকালীন ঘোষণা করে দিয়েছিল যে এই 'উত্তরাঞ্চল' পাকিস্তানেরই অংশ, এর সঙ্গে তথাকথিত 'আজাদ কাশ্মীর'-এর (যা এখনও ঔপচারিকভাবে পাকিস্তানের অংশ নয়, যদিও কাজে তাই-ই) কোনও সম্পর্ক নেই।

এত বড় গৌরচন্দ্রিকা করার উদ্দেশ্য এই কথা বোঝানো, যে জম্মু-কাশ্মীরের অধিবাসী বলতে শুধু কাশ্মীর উপত্যকার সুন্নী মুসলমান (শেখ আবদুল্লার জাতভাই) বোঝায় না। এই একটি সম্প্রদায়ের মানুষ জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। এরা এই রাজ্যে সবচেয়ে বড় সম্প্রদায় ঠিকই, কিন্তু এরাই সব নয়। ভারতের অন্যান্য অংশে যাঁরা সংখ্যালঘুর অধিকার নিয়ে লাফালাফি করেন তাঁদের এই জম্মু-কাশ্মীরের (সেই সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরও) সংখ্যালঘুদের কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

এবার রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আসি। স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, বৃটিশ ভারত এবং 'দেশীয় রাজ্য'। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য স্বাধীনতার আগে এমনই একটি 'দেশীয় রাজ্য' ছিল, যার শেষ রাজা ছিলেন মহারাজা হরি সিং। হরি সিং ছিলেন ডোগরা রাজপুত, কিন্তু রাজ্যের প্রজাদের বৃহদংশ ছিল মুসলমান। শুধু তাই নয়, সেই সময় এই রাজ্যের প্রবেশপথ ছিল মুসলিমপ্রধান পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে। জম্মু যেতে হলে সরাসরি ট্রেনে লাহোর-শিয়ালকোট হয়ে আসা যেত, শ্রীনগর যেতে হলে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মোটরে মারী, মুজফ্ফরাবাদ, বারামুলা হয়ে আসতে হোত। জম্মু থেকে সরাসরি শ্রীনগর যাবার পথ ছিল বটে,

কিন্তু তা বানিহাল গিরিপথ দিয়ে, পীরপঞ্জল পাহাড় পার হয়ে। শীতকালে বরফ পড়ে এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে বৃটিশ সরকার ৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে একটি ঘোষণা করে। ঘোষণায় বলা হয়েছিল, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি 'ডোমিনিয়ন' গঠিত হবে। ডোমিনিয়ন মানে সেই সব দেশ যারা কার্যত স্বাধীন কিন্তু নামে বৃটিশ রাজা বা রাণীকে দেশের প্রধান বলে মানে, যেমন কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ তারিখ পর্যন্ত ভারতও ডোমিনিয়ন ছিল। বৃটিশ ভারতের কোন কোন প্রদেশ ভারতে থাকবে, কোন প্রদেশ পাকিস্তানে যাবে তাও বলে দেওয়া হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলি, যেমন হায়দরাবাদ, মহীশূর, গোয়ালিয়র, বরোদা, বাহাওয়ালপুর ইত্যাদিগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল এই রাজ্যের রাজাদের ১৫ আগস্টের মধ্যে যে কোনও একটি ডোমিনিয়নে যোগ দিতে হবে। হিন্দুপ্রধান, হিন্দুরাজা শাসিত রাজ্য (যেমন বরোদা, গোয়ালিয়র, প্রভৃতি) অথবা মুসলমানপ্রধান, মুসলমান রাজা শাসিত (যেমন বাহাওয়ালপুর, কালাত প্রভৃতি) রাজ্যগুলির যোগদানে কোনও অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি। তারা যথাক্রমে ভারতে এবং পাকিস্তানে যোগাদান করে। কিছু কিছু হিন্দুপ্রধান হিন্দুরাজ্য গাঁইগুঁই করেছিল— যেমন ত্রিবাঙ্কুর (বর্তমান কেরালার অংশ)। কিছু হিন্দুপ্রধান মুসলমান শাসিত রাজ্য গুরুতর ঝামেলা করেছিল—যেমন হায়দরাবাদ, জুনাগড়, ভোপাল। কিন্তু এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে বাগে আনার ভার ছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উপর এবং তিনি অসাধারণ রাজনৈতিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে এদের পথে নিয়ে আসেন। এই রাজ্যগুলি প্যাটেলের হাতে না থাকলে কি হোত তা ভাবলে আজ শিউরে উঠতে হয়।

শিউরে ওঠার অন্যতম কারণ জম্মু-কাশ্মীর, যার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরু নিজে নিয়েছিলেন, প্যাটেলকে দেননি। সম্ভবতঃ তাঁর পূর্বপুরুষরা কাশ্মীর থেকে উত্তরপ্রদেশে এসেছিলেন, এইটাই নেহরুকে এই কাজ করতে প্ররোচিত করে। কাশ্মীর রাজ্যে ডোগরা রাজার সঙ্গে মুসলমান প্রজাদের খিটিমিটি লেগেই থাকত। সেই খিটিমিটির নেতা প্রজাদের পক্ষে ছিলেন শেখ আবদুল্লা। হরি সিং রাজা হিসাবে অত্যন্ত নিম্নস্তরের ছিলেন বলা যায়—বিলাসব্যসনে প্রভূত টাকা খরচ করতেন, সেই তুলনায় রাজ্যের উন্নতির জন্য কিছুই করতেন না। রাজ্য নিয়ে মাথাও ঘামাতেন না, মন্ত্রীদের উপর ছেড়ে দিয়ে বিলেতে ফূর্তি করতেন।

৩ জুন ১৯৪৭ তারিখের বৃটিশ সরকারের ঘোষণার পরও হরি সিং কোনও সিদ্ধান্ত নিলেন না, ভারতে যাবেন, না পাকিস্তানে। ইতিমধ্যে তাঁর রাজ্যের মধ্যে পাকিস্তানপন্থী মুসলমানরা নানারকম গোলমাল আরম্ভ করেছে। কিন্তু হরি সিং যথারীতি বিলাসব্যসনে দিন কাটাতে লাগলেন এবং রাজ্য চালাবার ভার প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক-এর উপর ছেড়ে দিলেন। কাকের পরামর্শে হরি সিং মতলব করেছিলেন তিনি স্বাধীন থাকবেন, তাঁর রাজ্য পরিণত হবে প্রাচ্যের সুইৎজারল্যাণ্ডে। সুইৎজারল্যাণ্ড ইউরোপের একটি ছোট্ট রাষ্ট্র, অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং আশপাশের সমস্ত রাষ্ট্র থেকে পৃথক। কিন্তু হরি সিং বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন, সুইৎজারল্যাণ্ডকে স্বাধীন এবং পৃথক করেছে তার জনসাধারণই, কোনও রাজা নয়। অত্যাচারী, অলস, বিলাসব্যসনে মত্ত হরি সিং-এর ক্ষমতা ছিল না তা করার।

জম্মু-কাশ্মীরে ঢোকার দুটি রাস্তাই ১৫ আগস্টের পর পাকিস্তানের খপ্পরে চলে গেল। হরি সিং তখনও ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তই নেননি। ভেবেছিলেন যেমন আছেন তেমনিই থেকে যাবেন। কিন্তু তারপর আরম্ভ হলো আসল গোলমাল।

স্বাধীনতার দুই মাসের মাথায় বেশ কিছু সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে এই পাকিস্তানী প্রদেশের নাম খাইবার-পাখতুনখোয়া)-এর উপজাতীয়রা প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গাড়ি নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডির পথে কাশ্মীরে ঢুকে পড়ল। এরা আসলে ছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সৈন্য, এরা জিন্নার হুকুমেই নিজেদের উর্দি ছেড়ে উপজাতীয়দের পোশাক পরে হৈ-হৈ করে এগিয়ে আসতে লাগল। মহারাজার এক ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী ছিল, তারা একটু প্রতিরোধের চেষ্টা করল, কিন্তু স্রোতের মুখে কুটোর মতো উড়ে গেল। এর পরে এই হানাদারবাহিনীর শ্রীনগরে পৌঁছতে কোনও বাধা রইল না।

বাধা যখন নেই তখন রাস্তায় একটু ফূর্তিফার্তা করতে আপত্তি কি? আর ফূর্তিফার্তা মানে—প্রথমেই নারীধর্ষণ। অতএব পাকিস্তানী হানাদারের সাজ খুলে সেনাবাহিনী নেমে পড়ল তাদের চিরাচরিত কাজে। বারো থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত কোনও মহিলা বাদ গেল না। এর মধ্যে একটি হাসপাতাল চালানোর কাজে রত কিছু খৃস্টান সন্ন্যাসিনীও ছিলেন।

এই ফূর্তিফার্তাই হানাদার বাহিনীর কাল হলো। ইতিমধ্যে হরি সিং উপায়ান্তর না দেখে ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। উত্তরে ভারত জানাল, তাদের সাহায্য নিতে হলে ভারতে যোগ দিতে হবে। অতএব মহারাজ হরি সিং সমস্ত দিবাস্বপ্ন ভুলে, ২৬ অক্টোবর ভারতে যোগ দেবার অঙ্গীকারপত্র, যাকে ইংরাজিতে বলে ঢন্দঋজত্তপ্পন্দ্ধঙ্ক ঙ্গন্দ্র ট্রস্তস্তন্দব্দ-ব্দন্দঙ্গঃ, তাতে সই করলেন। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হলো।

ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনবাহিনী ব্রিগেডিয়ার লায়োনেল প্রতীপ সেনের নেতৃত্বে যুদ্ধ সরঞ্জাম সমেত পীরপঞ্জল পাহাড় অতিক্রম করার মতো অসাধ্য সাধন করেছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীও শ্রীনগরের অপরিসর বিমান ঘাঁটিতে স্পিটফায়ার-এর মতো বিমান নামিয়ে ফেলেছে, যা সাহেবদের মতে সম্ভবই ছিল না। এইবার সেই সেনাবাহিনী হানাদারদের ধাওয়া করল। এখানে একটা কথা বলা দরকার। শারীরিকভাবে দুর্বল মাতৃজাতিকে যারা বলপূর্বক ধর্ষণ করে তারা চেহারায় যতই বিশাল হোক, মানসিক দিক দিয়ে কাপুরুষ। তাই হানাদাররা পালাবার পথ ধরল, ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের তাড়া করল। আর আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় পেলে ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই শয়তান হানাদারদের কাশ্মীরের পার্বত্যভূমি থেকে পাঞ্জাবের সমতলে নামিয়ে দিতে পারতো।

এইবার একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা কতটা আশ্চর্য তা বুঝতে হলে একটা উপমা দিতে হবে।

ধরুন আপনার একটা বিশাল বাগানবাড়ি আছে, তার এক প্রান্তে আপনি বসে আছেন। হঠাৎ আপনি দেখলেন একটা চোর সদর দরজা দিয়ে ঢুকে আপনার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আপনার পকেটে, ধরুন, আগ্নেয়াস্ত্র আছে, সেই আগ্নেয়াস্ত্র বার করতেই, চোর দরজার দিকে দৌড়ল, আপনি তার পিছু নিলেন। বিদ্যুৎবেগে চোর দৌড়োচ্ছে, ঘরের পর ঘর পেরিয়ে যাচ্ছে। আপনি তার পিছনে দৌড়োচ্ছেন। এর পরিণতি কি হতে

পারে? এক হতে পারে আপনি গুলি ছুঁড়ে চোরটাকে ঘায়েল করে দিলেন। আর হতে পারে, আপনি চোরটাকে ধরতে পারলেন না বটে, কিন্তু তাকে পগার পার করে দিলেন, জন্মের মতো আপনার বাড়িতে চুরি করার শখ তার ঘুচিয়ে দিলেন।

এর বদলে, যদি ধরুন যখন আপনি চোরের পিছন পিছন ঘরের পর ঘর পার হচ্ছেন, তখন হঠাৎ থেমে যান। থেমে গিয়ে নিজেই একটা লাইন টেনে চোরকে বলেন, দেখ, এই লাইনের এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার। এবার আমরা পাশের বাড়ির শ্যামবাবুকে সালিশ মানব, এই বাড়ির মালিক কে?

এবম্বিধ আচরণ যদি করেন তবে আপনাকে কি বলা হবে— গর্দভ না উন্মাদ? সম্ভবত দুই-ই!

ভুট্টো-ইন্দিরার মধ্যে সাক্ষরিত সিমলা চুক্তি।

অথচ এই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু তাই-ই করেছিলেন। যখন আমাদের সেনাবাহিনী হানাদারদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তখন পণ্ডিতজী হঠাৎ একতরফাভাবে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে দিলেন। যুদ্ধ বিরতি রেখার এদিকটা আজকে আমাদের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য, অন্যদিকটা পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর। তারপর পণ্ডিতজী অসাধারণ পাণ্ডিত্য ফলিয়ে এই বিতর্কটিকে—যা বিতর্ক হওয়াই উচিত ছিল না—রাষ্ট্রসঙেঘ নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এবার রাষ্ট্রসঙঘই বিচার করুক, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতের না পাকিস্তানের।

কী বলবেন আপনি? বলবেন, কেন, কোন পণ্ডিতজী এরকম কাজ করলেন, অনন্তকালের জন্য কাশ্মীর সমস্যা সৃষ্টি করে গেলেন!

কেন পণ্ডিতজী এই পাণ্ডিত্য ফলালেন—যাকে পৃথিবীর ইতিহাসে রাজনৈতিক নির্বুদ্ধি তার বিরলতম নিদর্শন বলা যায়—তার বহু ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কোনটিরই সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। কিছু কংগ্রেসী এর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে যে নেহরুর উপর আন্তর্জাতিক চাপ ছিল। চাপ থাকতেই পারে—কিন্তু তার কাছে নতিস্বীকার করলেন কেন? চীন তো সেই সময় তিববত দখল করে নিল, তারা তো চাপের তোয়াক্কা করেনি! অন্য প্রচুর ব্যাখ্যা আছে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে লেডি মাউন্টব্যাটেন ঘটিত। আজকে একথা স্বীকৃত—লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেনের একমাত্র কন্যা পামেলা মাউন্টব্যাটেন তাঁর অংশত-আত্মজীবনী 'ইন্ডিয়া রিমেমবার্ড-এ' তিনি পরিষ্কার করেই লিখেছেন, বহুকাল-বিপত্নীক নেহরু কত গভীরভাবে লেডি এডুইনার প্রেমে পড়েছিলেন। বস্তুতঃ দুয়ে দুয়ে চার করলে এই কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন নিজের স্ত্রীকে লেলিয়ে দিয়ে নেহরুকে দেশভাগে রাজি করেছিলেন।

লিখিত "নেহরু অ্যান্ড এডুইনা" উপন্যাসেও এইরকম ইঙ্গিত আছে। কাশ্মীরে একতরফা যুদ্ধ বিরতির অন্যতম সুপরিচিত ব্যাখ্যা হচ্ছে, লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন বৃটেনের স্বার্থে এটা চাননি যে স্বাধীনতার পরেই পাকিস্তান ভারতের কাছে বেদম মার খায়—বরঞ্চ বৃটেনের কল্পনায় এটাই ছিল যে ভারত ও পাকিস্তান মোটামুটি একই রকম শক্তিশালী থাকবে, যাতে কোনও পক্ষই অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে বৃটেনের পক্ষে ভয়ের কারণ না হতে পারে। এ প্রসঙ্গে এটাও বলা প্রয়োজন যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, যিনি স্বাধীনতার আগে ভারতের ভাইসরয় এবং গভর্নর-জেনারেল ছিলেন, তিনি স্বাধীনতার পরেও নেহরুরই অনুরোধে গভর্নর-জেনারেল থেকে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানে জিন্না কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ দেননি, জিন্না নিজেই গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেন বৃটেনের স্বার্থসিদ্ধি আবার করালেন স্ত্রীকে লেলিয়ে দিয়ে—এডুইনা নেহরুকে বোঝাতে সমর্থ হলেন যে যদি নেহরু একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে ব্যাপারটা রাষ্ট্রসঙেঘর হাতে ছেড়ে দেন তবে তাঁকে সারা জগৎ ধন্য ধন্য করবে এবং তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাবেনই। পেয়েছিলেন ঘোড়ার ডিম এবং দেশের জন্য চিরকালীন এক সমস্যা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন আমাদের পণ্ডিতজী।

রাষ্ট্রসঙঘ পরে সাব্যস্ত করে যে কাশ্মীর গণভোট হবে এবং দুই বিবদমান দেশের সৈন্য রাজ্য ছেড়ে সরে যাবে। কোনও সৈন্যই সরে যায়নি, অতএব গণভোটের প্রশ্ন ওঠে না। যে সমস্ত পাকিস্তানপন্থী 'মানবাধিকারবাদী' (যেমন পশ্চিমবঙ্গের এ পি ডি আর) এখন গণভোটের কথা বলেন তারা সুকৌশলে এটা চেপে যান।

এই কীর্তি করেই কিন্তু পণ্ডিত নেহরু ক্ষান্ত হলেন না। যখন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতে যোগদান করেইছে তখন উচিত ছিল তাকে আর পাঁচটা রাজ্যের মতোই রাখা, যেমন হায়দরাবাদ বা মহীশূরকে রাখা হয়েছে—পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালের রাজ্য পুনর্গঠনের পরে এই সব রাজ্যের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কাশ্মীরের হয়নি। কারণ নেহরু তাঁর বন্ধু শেখ আবদুল্লার পরামর্শে জম্মু-কাশ্মীরকে একটি 'এসপেশাল' রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। কোনও ভারতীয় নাগরিকের এই রাজ্যে জমি কেনার অধিকার ছিল না (এখনও নেই)। এমন কি জম্মুর অধিবাসীদেরও

কাশ্মীর উপত্যকায় জমি কেনার অধিকার ছিল না (এখনও নেই)। সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের (যা ঘোষিত ভাবে 'অস্থায়ী ব্যবস্থা', কিন্তু আজ পর্যন্ত চলছে) মাধ্যমে কাশ্মীরের জন্য আলাদা সাংবিধানিক ব্যবস্থা করেছিলেন;এবং সবচেয়ে অপমানজনক যা, ভারতের নাগরিকদেরও জম্মু-কাশ্মীর রাজত্বে ঢুকতে হলে 'পারমিট' প্রয়োজন হোত। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পারমিট ছাড়া কাশ্মীরে প্রবেশ করেন এবং পরে সেখানেই অত্যন্ত রহস্যজনক পরিস্থিতিতে প্রাণত্যাগ করেন। ফলে শেষপর্যন্ত এই পারমিট প্রথার বিলুপ্তি হয়।

যখন আমাদের স্বপ্নবিলাসী প্রেমিক প্রধানমন্ত্রী ভারতের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরের জন্য এই সব করছিলেন তখন বাস্তববাদী পাকিস্তান কি করছিল? তারা তাদের অধিকৃত কাশ্মীরে বাধাবন্ধনহীন ভাবে সমতলের মানুষ অর্থাৎ পাঞ্জাবী মুসলমানদের সেখানে থাকবার এবং বাড়ী জমি কেনবার সুযোগ দেয় এবং অচিরেই প্রচুর পাঞ্জাবী মুসলমান সেখানে বসবাস আরম্ভ করে। এর পরে জিয়াউল হকের রাজত্বকালীন সময়ে 'নর্দার্ন এরিয়াজ' অঞ্চ ল—অর্থাৎ গিলগিট, হুনজা, স্কারদু প্রভৃতিকে পাকিস্তানের সঙ্গেই মিশিয়ে দেওয়া হয়।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে যে দেশই সীমান্তবর্তী অঞ্চ লে কোনও এক জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখে এবং মনে করে যে ভবিষ্যতে এই জনগোষ্ঠী গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে, তখন সেই দেশ ওই অঞ্চ লে অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষকে বসিয়ে প্রথমোক্ত জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য খর্ব করার চেষ্টা করে। এই জিনিস আমরা বাংলাদেশে দেখেছি—সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চ লে বৌদ্ধ চাকমাদের প্রাধান্য খর্ব করার জন্য জিয়াউর রহমানের আসলে পরিকল্পিত ভাবে সমতল থেকে আসা বাঙালি মুসলমানদের বসতি করতে দেওয়া হয়েছে। এই জিনিস আমরা ইজরায়েলে দেখেছি, যেখানে 'পশ্চিম তট' (West Bank) এলাকায় প্যালেস্টিনীয় প্রাধান্য কমাতে ইহুদীদের বসতি করতে দেওয়া হয়েছে। দেখিনি শুধু ভারতে কাশ্মীরে।

এর পরেও কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের একটা সুবর্ণ সুযোগ ভারতের হাতে এসেছিল—নেহরুর আমলে নয়, তাঁর কন্যা ইন্দিরার আমলে। বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারত জিতবার পরে তিরানববই হাজার পাকিস্তানী সৈন্য ভারতে যুদ্ধ বন্দী হয়েছিল। এই সৈন্যদের ছাড়িয়ে আনবার জন্য পাকিস্তানে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো-র (যার জীবনান্ত হয় ফাঁসির দড়িতে) উপর অসাধারণ চাপ সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভুট্টো তাদের ছেড়ে দেবার অনুরোধ নিয়ে সিমলায় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করতে এসেছিলেন। সেখানে ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বলেছিলেন কাশ্মীরের বর্তমান যুদ্ধ বিরতি রেখা (সেই জওহরলাল নেহরুর নির্বুদ্ধি তার ফসল)-কে আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে মেনে নিতে। উত্তরে ভুট্টো বলেছিলেন, "আমারও তো তাই ইচ্ছে! কিন্তু এই কাজ যদি আমি এখন করতে যাই তা হলে দেশের লোক আমাকে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু যদি আমি এই তিরানববই হাজার সৈন্যকে দেশে ফেরাতে পারি তা হলে আমার উপরে দেশের মানুষের যে বিশ্বাস তৈরি হবে তাকে পাথেয় করে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারব, কাশ্মীর সমস্যাও মিটে যাবে"। এই কথা ইন্দিরা বিশ্বাস করে, কোনও লিখিত আকারে ভুট্টোর কাছ থেকে অঙ্গীকার না নিয়ে, স্রেফ মুখের কথায়, এদের ছেড়ে দিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল, গণহত্যা করেছিল (রতনলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত "জগন্নাথ হলের গণহত্যা" দ্রষ্টব্য)। তার জন্য এদের ন্যুরেমবের্গ-ধরনের (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে র পরে জার্মানীর ন্যুরেমবের্গ শহরে ষাট লক্ষ ইহুদীকে গণহত্যা করার অপরাধীদের বিচার হয়। এতে কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি।) বিচার হওয়া উচিত ছিল। কিছু হলো না। ভুট্টো ইন্দিরা গান্ধীকে বুদ্ধু বানিয়ে সৈন্য নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন, তারপর সেখান থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন, প্রাণ গেলেও কাশ্মীরের উপর আমাদের দাবী ছাড়ব না, কাশ্মীর আমাদের হবেই, ইনশাল্লাহ।

এর পরে আশির দশকে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো এবং দেশের সর্বাধিনায়ক হলেন জেনারেল জিয়াউল হক। ইনি অসম্ভব মৌলবাদী কট্টর মুসলমান ছিলেন। এঁরই আমলে কুখ্যাত ব্ল্যাসফেমি ল'-চালু হয়। যার বলি খৃস্টান মহিলা আসিয়া বিবি এবং যার বিরোধিতা করতে গিয়ে উদারপন্থী পাক-পাঞ্জাবের রাজ্যপাল সালমান তসীর প্রাণ দিলেন। জিয়াউল হকের অন্য কীর্তি হচ্ছে ভুট্টোর ফাঁসি। জিয়াউল হক সিদ্ধান্ত করলেন যে ভারতের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে তাঁরা কখনওই পারবেন না—হেরে যাবেন, যেমন হেরেছিলেন ১৯৬৫, ১৯৭১ সালে। তাই যুদ্ধ অন্য উপায়ে করতে হবে—যাকে বলে 'লো ইনটেনসিটি ওয়ার'। আজকের ভারতে ইসলামী উগ্রপন্থী, অগণিত বিস্ফোরণ, সিমি-সদৃশ সংগঠন এরই ফল। কাশ্মীরে সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে ঢিল মারাও এরই প্রকাশ। কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের বিতাড়নও এরই ফসলা।

মোটামুটিভাবে কাশ্মীর-কুনাট্যের ইতিহাস এই-ই জওহরলাল নেহরুর অপরিসীম রাজনৈতিক নির্বুদ্ধি তার ফসল আজকে আমাদের বইতে হচ্ছে—আরও কত প্রজন্মকে বইতে হবে, কে জানে? আমাদের কপালেই কেন এইরকম প্রেমিক, উন্মাদ, নপুংসক নেতা জোটে?

সন্ত্রাস ও মৌলবাদ

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

ভারতীয় রাজতন্ত্রের মহামান্য যুবরাজের একটা মন্তব্য থেকে জানা গেল যে, সন্ত্রাসবাদ ও হিন্দু মৌলবাদ দেশের পক্ষে একই রকম ক্ষতিকর ব্যাপার। যদি তিনি বলতেন, সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদ দুটোই নিন্দনীয় ব্যাপার, তাহলে আমাদের মতো অনুগত প্রজারা অবনতভাবে সেটা মেনে নিত। কিন্তু যে রক্তাক্ত সন্ত্রাসবাদ অন্য রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে এবং এই দেশের কিছু লোকের সহযোগিতায় এই দেশকে আতঙ্কিত করে চলেছে, সেটা হিন্দু-মৌলবাদের সমতুল্য? বরং আরও বেশি নিন্দনীয় কি বেশি প্রগতিশীলতা ও ভ্রান্ত সেকুলার-তত্ত্ব নয়?

কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদের ঘটনা, মার্কিন সেন্টারে হানা, পার্লামেন্টে হত্যালীলা, তাজ হোটেলে নরহত্যা, কাশ্মীরের দৈনন্দিন বিস্ফোরণ ইত্যাদি অবশ্যই মুসলীম সন্ত্রাসবাদের নারকীয় নিদর্শন। কিন্তু এগুলোর সঙ্গে বিজেপি বা আর এস এস-এর রীতিনীতি বা কার্যকলাপ কি সমগোত্রীয়?

আমাদের দেশে হিন্দু মৌলবাদ প্রসঙ্গে এই সব দল বা সংস্থাকেই জড়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের ইতিহাস, রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান বা ধারণা থাকলে এদের সঙ্গে ইস্‌লামিক সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারকে একই স্তরে রাখা যায়? তাহলে এখন আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও কেন এই সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে চলেছে?

এটা ঠিক যে, বিজেপি প্রভৃতি দল হিন্দুত্বের কথা বলে। কিন্তু তার তাৎপর্য যেমন আলাদা, তেমনি তাদের কর্মসূচী ও কার্যকলাপও অন্যান্য দলের থেকে ভিন্নধর্মী। পূর্বোক্ত দল বা গোষ্ঠীগুলো কখনও মুসলীম, খৃস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে বলেছে বা তাদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছে? তাঁদের ভিন্নধর্মী আইন বা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনওদিন তারা শোষিত বা বঞ্চি ত করতে চেয়েছে। 'জিজিয়া' করের মতো কিছু ধার্য করার দাবি তুলেছে তারা? ভিন্ন ধর্মের ওপর আঘাত হেনেছে? গরিষ্ঠদের ধর্মের ওপর ভিত্তি করে এই সব দল বা সংস্থা কখনও 'সেকুলার' রাষ্ট্রটার মৌলিক রূপটাকে বদলে ফেলতে চেয়েছে? আমাদের সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদ প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে পছন্দমতো ধর্ম গ্রহণ, ধর্মাচরণ ও ধর্মান্তরকরণের অধিকার দিয়েছে—এই কারণে

নরেন্দ্র মোদীকে জঘন্য খুনী সাজিয়ে যারা সারাদেশ তোলপাড় করেছিল, তাদের উদ্দেশ্যই ছিল এক ক্লিন্ন রাজনীতির মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি করা। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা ফায়দা তোলার জন্য তিলজলাতে স্থান দিয়েছিল কুতুবুদ্দীন আনসারীকে যাঁর ছবি আমরা দেখেছি— কান্নামুখে দাঙ্গাকারীদের কাছে জোড়হস্তে ক্ষমাভিক্ষা করছেন। তাঁকে নির্বাচনের আগে সেলাইমেশিন কিনে দেওয়া হয়েছিল, পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতিও ছিল অনেক। কিন্তু নির্বাচনের পর কি হলো?

সংবিধান-বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু লিখেছেন, ভারত কিন্তু আমেরিকা, পাকিস্তান, বৃটেন ইত্যাদি দেশের তুলনায় অনেক বেশি ধর্মনিরপেক্ষ—(ইন্ট্রোডাক্শান টু দ্য কন্স্টিটিউশান অফ্ ইন্ডিয়া, পৃঃ)। পূর্বোক্ত কোনও দল বা সংগঠন এটা সব অনুচ্ছেদকে বাদ দেওয়া বা বদলে নেওয়ার দাবি তুলেছে কোনদিন?

বিজেপি-কে বলা হয় জনসঙেঘর নতুন রূপ—'The BJP is generally looked upon as a re-brith of the Jana Sangh'—(এস এল সিক্রি—গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স ইন্ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৪৯)। কিন্তু এই দল কি আদৌ মৌলবাদী বা মুসলীম বিরোধী, বা উগ্র হিন্দুত্ববাদী? ডঃ বি সি রাউত মন্তব্য করেছেন—এই দলের মূল স্লোগানটা ছিল—'one country, one culture, one nation'—(ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট ইন্ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৯৮)। দেশের সব মানুষকে একই ধর্মের হতে হবে না সংখ্যালঘুদের হিন্দুতে পরিণত করতে হবে—এমন দাবি তো এই দল করেনি। দেশের মানুষকে একই জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ করা এবং একই সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল উক্ত দলের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লক্ষ্য। এটা কি মৌলবাদ? ধর্ম পৃথক হতেই পারে, কিন্তু আইনও কি হবে ভিন্নধর্মী? ডঃ হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন—'The party belived in extreme nationalism and patriotism'—(ইন্ডিয়া ঃ ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ৩২০)।

তাহলে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম নিন্দনীয় জিনিষ! এই সব সংস্থার 'হিন্দুত্ব' কিন্তু জাতিবাচক—ধর্ম নয়।

শিবসেনা, আর এস এস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এখন বিজেপি-র সঙ্গে যুক্ত আছে। কিন্তু তারাও কি হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধবংস করে? তারা খৃস্টান, মুসলমান ইত্যাদি নাগরিকদের কখনও ধবংস করার কথা বলেছে? তাদেরও লক্ষ্য হলো—ভারতীয়দের একটা জাতিতে পরিণত করা—ধর্ম পৃথক থাকতে পারে, কিন্তু সবাইর মধ্যে কেন থাকবে না একটা ভারতবোধ? কেন সবার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হবে না ভারতীয় জাতীয় সত্ত্বা?

এক বাম-নেতা বলেছিলেন তিনি আগে মুসলমান, পরে ভারতীয়। আমরা কিন্তু বলি—আমরা ভারতীয়—হিন্দু, বা মুসলমান বা খৃস্টান—সেটা পরের কথা।

যদি আমরা এই সব মানুষকে 'ভারতীয়' হতে বলি—তাহলে আমরা মৌলবাদী?

একবার এক মুসলীম ছাত্র ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট টেস্টে পরাজিত হওয়ায় বলেছিল—'আমাদের আক্রাম খাঁ আসেনি, তাই এই বিপর্যয়। বিস্মিত হয়ে তাকে বলেছিলাম—খেলাটা কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে হয়নি, হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে—সুতরাং আক্রামকে 'আমাদের' বলা ঠিক নয়।

কিন্তু সমস্যাটা হলো—এই সম্প্রদায়ের যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, বুঝেছি যে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আরব-রাষ্ট্রগুলো ইত্যাদিকে নিয়ে যে 'প্যান-ইসলামিক' আবেগ জড়িত হয়ে আছে তার থেকে তাঁদের মুক্ত হওয়ার সুযোগ তাঁদের নেই। দেশ নয়, ভারত নয়—

এঁদের পরিচয় ধর্ম দিয়ে, সেই ভাবাবেগই তাঁদের একটা আলাদা 'আইডেন্‌টিটি' দিয়েছে। তাঁরা ভারত-রাষ্ট্রে থাকবেন—কিন্তু সেই রাষ্ট্রের মধ্যেই তাঁরা গড়ে তুলেছেন একটা পৃথক রাষ্ট্র। সেটা ধর্ম দিয়ে গড়া।

আমাদের সংবিধানের ৪৪নং অনুচ্ছেদে আছে—সারা দেশের সব মানুষের জন্য এক ও অভিন্ন আইন রচনা করতে। সেটা অবশ্যই স্বাভাবিক ব্যাপার—কারণ, ধর্ম ভিন্ন ধরনের হলেও আইন হওয়া উচিত অভিন্ন। কিন্তু এই সম্প্রদায় তাঁদের শরিয়ৎকে অনুসরণ করেই থাকতে চায়। শাহবানো বনাম আমেদ খানের মামলায় প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় মন্তব্য করেছিলেন—এই ধরনের আইন রচনা জাতীয় ঐক্য স্থাপনে সাহায্য করতে পারত—A common civil code will help the cause of national integration'। ডিয়েঙ্গডে বনাম চোপরার মামলায় বিচারপতিরা বলেছিলেন—দেশের সব মানুষের জন্যে অভিন্ন আইন রচনা করতেই হবে। আর সরলা মুদগলের মামলায় বিচারপতি কুলদীপ সিং মন্তব্য করেছিলেন, এই ব্যাপারে কোনও সম্প্রদায় বাধার সৃষ্টি করতে পারে না—ধর্ম নয়, এক্ষেত্রে একমাত্র আইনসভার হাতে রয়েছে চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই বিচারপতিরাও কি মৌলবাদী?

আরও বড় প্রশ্ন হলো—বিগত তেষট্টি বছরে নানা ধরনের সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসেছে— অথচ কেউ এই বিষয়ে কিছু করেনি কেন?

তার উত্তর একটাই—মুসলীম ভোট হারানোর ভয়। এই ব্যাপারে দাবি তোলাটাও কি মৌলবাদের লক্ষণ? রাজীব-সরকার সুপ্রীম কোর্টের রায়কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সংবিধান বদল করেছেন—সেটাই তাহলে প্রগতিশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা?

এটা জিজ্ঞেস করা যায়—যুবরাজের দলের প্রধানমন্ত্রী আবেগে উদ্বেল হয়ে বলে ফেলেছিলেন যে, দেশের অর্থ ও সম্পদের প্রথম মালিক হলেন মুসলমানরাই—এটাও কি ধর্মনিরপেক্ষতা? বামপন্থীরাও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা ভেবে বিভিন্ন কেন্দ্রের নির্বাচনে প্রার্থী দেয়, রাজ্যে মুসলীম-জেলা তৈরী করে। বিকৃতকাম শিল্পীর আঁকা নগ্ন সীতা-দেবীর ছবি নিয়ে তারা কথা বলে না, কিন্তু তস্‌লীমা নাসরিনকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে প্রাচীনপন্থী বলে মন্তব্য করার পর মৌলবাদীদের ধমক খেয়েই জানায় যে, দেশের মধ্যে তারাই এই শিক্ষার ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি ব্যয় করে, সুপ্রীম কোর্টের রায় অগ্রাহ্য করেই ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

এই সব অনাচারের প্রতিবাদ করাটা কি হিন্দু মৌলবাদের লক্ষণ?

প্রগতিশীলদের ভূমিকাটা একটু লক্ষ্য করা যাক।

গোধ্‌রা-দাঙ্গা নিয়ে তাঁরা সারাদেশে হৈ-চৈ করেছিলেন, নিন্দা-বাক্যে ভরিয়ে দিয়েছিলেন দেশটাকে। কিন্তু তার আগে করসেবকদের ট্রেনের ভেতর কিভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল? এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একটা তদন্ত-কমিশন বসিয়েছিল। কিন্তু প্রগতিশীল রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ তড়িঘড়ি আরেকটা কমিশন গঠন করেছিল। যে দেশে তদন্ত-কমিশনের রিপোর্ট বেরয় না বা বেরুলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না—সেখানে হঠাৎ অন্তর্বর্তী রিপোর্ট বেরিয়ে গেল এবং তাতে বলা হলা, ভেতরেই আগুন লেগেছিল। আর তারপরে কিন্তু অন্য কমিশনের রিপোর্ট বাইরে থেকেই অগ্নিকাণ্ডের আভাস দিয়েছে। করসেবক হত্যা কি হত্যা নয়?

একেই বলে প্রগতিশীলতা? গোধ্‌রা-পরবর্তী দাঙ্গা নিয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে 'ভিলেন' সাজানো হয়েছে, তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে 'মৃত্যুর সওদাগর।'

কিন্তু পুলিশের রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে, দাঙ্গাটা আদৌ একতরফা হয়নি—মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরই। আর সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট-নিযুক্ত 'স্পেশাল ইন্‌ভেস্টিগেশান টিম' ছত্রচবগ্ন জানিয়েছে—এই দাঙ্গার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দোষী বলা যায় না। অন্যদিকে এই মামলায় মিথ্যে হলফনামা পেশ করেছেন বলে অভিযোগকারিণী তিস্তা শীতলবাদকে তিরস্কার করেছে আমেদাবাদের সেশন-কোর্টের বিচারক এস এইচ ভোরা।

নরেন্দ্র মোদীকে জঘন্য খুনী সাজিয়ে যারা সারাদেশ তোলপাড় করেছিল, তাদের উদ্দেশ্যই ছিল এক ক্লিন্ন রাজনীতির মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি করা। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা ফায়দা তোলার জন্য তিলজলাতে স্থান দিয়েছিল কুতুবুদ্দীন আনসারীকে যাঁর ছবি আমরা দেখেছি—কান্নামুখে দাঙ্গাকারীদের কাছে জোড়হস্তে ক্ষমাভিক্ষা করছেন। তাঁকে নির্বাচনের আগে সেলাইমেশিন কিনে দেওয়া হয়েছিল, পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতিও ছিল অনেক। কিন্তু নির্বাচনের পর কি হলো? 'দ্য স্টেট্‌সম্যান'-এর রিপোর্টে আছে—'But, soon after the elections were over, Qutubuddin had to leave Bengal, reportedly complaining that the promises were note kept. The improved law and order in Gujarat also helped him return home'—(২০ ডিসেম্বর)। রাহুলবাবু, এরাও কি মৌলবাদী নয়?

রামমন্দির—বাব্‌রি নিয়ে আরও বেশি গণ্ডগোল পাকানো হয়েছে। জ্যোতি বসুর মতে, 'বিজেপি ও তার সঙ্গীরা বর্বর—ওরা মসজিদ ভাঙে'। ঘটনাটা উত্তরপ্রদেশের—কিন্তু সেই রাজ্যসহ আরও তিনটে বিজেপি শাসিত রাজ্যের সরকারকে তখন ভেঙে দেওয়া হয়েছিল কেন?

কিন্তু এবার সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগই জানিয়েছে—সৌধটার নিচে ছিল মন্দির, তার ধবংসাবশেষের ওপরেই তৈরি হয়েছে মস্‌জিদ। এই জন্যই বলা হয়—সেই ধবংস কাজটা বাবরের আমলেই সম্ভবত হয়েছিল। এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাই সংলগ্ন এলাকার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দিতে চেয়েছে সুন্নি বোর্ডকে। জ্যোতিবাবু জানিয়ে যেতে পারলেন না—কোন্ মসজিদটা হিন্দু মৌলবাদীরা ভেঙেছেন।

তাই 'লস্কর', 'সিমি' প্রভৃতি সংস্থা এবং আর এস এস-বিজেপি—শিবসেনা একই রকম সংস্থা? ●

কাশ্মীরী জঙ্গিদের পুনর্বাসন

তারক সাহা

২০১০-এর শুরুতে কাশ্মীরে যে হিংসার আগুন জ্বলছিল তাতে বেশ বে-কায়দায় পড়েছিলেন অপেক্ষাকৃত নবীন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। এই অবস্থায় রাজ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা যখন নিম্নগামী তখনই একটা চমক দিতে চাইলেন। আসলে ওমর একটা নতুন চমক দিতে চাইলেন যেমন আর পাঁচজন ঝানু রাজনৈতিক নেতারা করে থাকেন। চমকটা কি? শেষ হয়ে যাওয়া বছরের শুরুতে ওমর ঘোষণা করলেন যে, তিনি চান যত কাশ্মীরী যুবক বিপথে গিয়ে সীমান্তের ওপারে পাকিস্তানে চলে গিয়েছে জঙ্গিহানার তালিম নিতে, তাদেরকে রাজ্যে পুনর্বাসন দিতে। তাঁর এই প্রস্তাবে নয়াদিল্লির সীলমোহরও পড়ে গিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, ১৯৮৯ থেকে ২০০৯ অবধি—এই কুড়ি বছরে যেসব যুবক এদেশ ছেড়ে লস্কর-ই-তৈবা বা জইশ-ই-মহম্মদের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসবাদীর তালিম নিতে গিয়েছে, তাদের সকলকে এদেশে জামাই আদরে বরণ করা হবে। এই সূত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম সেনাবাহিনীর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

রাজ্যের এক পদস্থ কর্তার মতে, অধিকাংশ বিপথগামী কাশ্মীরী যুবক পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে চায়, তারা পাকিস্তান ত্যাগ করতে চাইছে। কিন্তু পালাতে পারছে না এমন তিন হাজার যুবক অধিকৃত কাশ্মীরে অপেক্ষমান— এই তথ্য রাজ্য পুলিশের। এইসব জঙ্গিদের কাশ্মীরে ফিরিয়ে আনতে তৎপর প্রশাসন উদ্যোগ নিতে শুরু করে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশের বড় কর্তা এই মর্মে ঘোষণা করেছেন যে, জঙ্গিরা পাকিস্তানে চলে যাবার আগে যে যে অঞ্চলে তারা বসবাস করত সেই অঞ্চলে ফেরার জন্য স্রেফ তাদের একটা নির্দিষ্ট ফর্ম-এ আবেদন করতে হবে। তাহলেই বাজিমাৎ!

এইসব আবেদন প্রথমে জেলা পুলিশ সুপার পরীক্ষা করে দেখবেন এবং তারপর তা রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তরে পাঠানো হবে এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা/নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে ও

জঙ্গিদের বিস্ফোরণে নিহত নিরীহ মানুষ।

আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে যদি কোনও থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ থাকে তা পরীক্ষার পরই তাদের এদেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হবে।

বলা হচ্ছে, জম্মু-কাশ্মীরে ঢোকার মুখেই এইসব সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে একদফা অঙ্গীকার করিয়ে নেওয়া হবে যে, তারা এদেশের সংবিধান মেনে চলবে, অস্ত্র পরিহার করবে এবং হিংসার পথ ছাড়বে। মজার ব্যাপার যে, রাজ্যের মহিলারা যারা পুরুষদের বিয়ে করেছে, যাদের কোনও দেশেরই নাগরিকত্ব নেই এমন মহিলারাও তাদের স্বামী-পরিজন নিয়ে এদেশে ঠাঁই পেতে পারবে।

বহু পুরুষ জঙ্গি পাকিস্তানে আশ্রিত থাকার সময়ে সে দেশের মহিলার সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, তারাও সরকারী এই ঘোষণার ফায়দা নিতে চাইছে। এরাও তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে এদেশে পুনর্বাসন চাইছে। সূত্রের মতে এইসব জঙ্গিদের এদেশে কাউনসেলিং করে মগজধোলাই দিয়ে 'দেশভক্ত' বানানো হবে।

রাজ্য সরকার এদের ফেরার নীতি নির্ধারণ করবে এবং যারা এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে চায় তাদের অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থাও করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এদের ঝাড়াই-বাছাই করে 'বিশুদ্ধ দেশভক্ত'দের নাম পাঠাবে বিদেশমন্ত্রকে এবং বিদেশমন্ত্রক পাকিস্তানের দূতাবাসে তাদের তালিকা পাঠাবে এবং সেই অনুসারে তারা ফিরবে এদেশে।

আসলে ওমরের ওই ভাবনা তাঁর কোনও মৌলিক চিন্তা নয়। এই ভাবনা প্রথমে এসেছিল ২০০৪ সালে মুফতি মহম্মদ সরকারের মাথায়। সেই সময় রাজ্য সরকার বলেছিল, যেসব জঙ্গি জাতীয় মূলধারায় ফিরে আসতে চায় তাদের প্রত্যেকের নামে দেড় লক্ষ টাকা ব্যাংকে স্থায়ী আমানতে রাখা হবে এবং মাথাপিছু ২০০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে যতদিন তাদের পাকাপাকিভাবে পুনর্বাসন না হয়। মুফতির এই প্রকল্পে তেমন সাড়া মেলেনি। জঙ্গিরা বরং পাকিস্তানে থেকেই জেহাদে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বলে মনে করত। উল্টো দিকে স্বল্পসংখ্যক যেসব যুবক এই প্রস্তাব মানল তারা কিন্তু সরকারের ঘোষণা মতো টাকা-পয়সা পায়নি।

এবারের পুনর্বাসন প্রকল্পে কিন্তু কোনও অর্থকরী বিষয়গুলি রইল না। কিন্তু এই নীতি কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ঝুলেই থাকলো। কারণ পাকিস্তান এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। পাকিস্তান দুনিয়াকে অন্তত সরকারীভাবে জানাবে না যে তাদের দেশের মাটি থেকে এদেশের কাশ্মীরি যুবকদের সন্ত্রাসবাদী ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। ওমর শঙ্কিত এইজন্য যে, তাঁর এই প্রচেষ্টা যদি ফলপ্রসূ না হয় তবে বিপথগামী এইসব জঙ্গিরা বে-আইনিভাবে নেপাল, বাংলাদেশ দিয়ে এদেশে ঢুকে পড়বে।

কিন্তু এই প্রকল্পের অনেক বিরোধীও রয়েছে। কারণ এই প্রকল্প কোনও ব্যবসায়িক লেন-দেন নয়। পাকিস্তানে এইসব জঙ্গিরা পুষ্ট হচ্ছে এবং তাদের মগজধোলাই করে সীমারেখা লঙ্ঘন করে জঙ্গি-হামলা করতে ভারতে পাঠাচ্ছে—এই সত্য পাকিস্তান প্রকাশ করতে

চায় না। সুতরাং পাকিস্তান যে সহজে এদের ফেরৎ পাঠাবে না এটা খুব সহজবোধ্য। অনেকের মতে প্রায় অসম্ভবকে বাস্তবায়িত করার এমন পরিকল্পনা অবশ্যই লোক দেখানো ব্যাপারে। বিরোধিতার সুর যেভাবে চরমে উঠিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তার থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার এক পরিকল্পিত প্রয়াস ওমরের।

জঙ্গি ডেরা থেকে বাজেয়াপ্ত অস্ত্রশস্ত্র দেখানো হচ্ছে।

এই বিষয়ে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বহু যুবক তাদের পরিবারের মাধ্যমে নিরপত্তাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে যাতে তারা তাদের পরিবারের সঙ্গে পুনরায় মিলতে পারে। সূত্রের মতে চার বছর আগে সেনাবাহিনী ২০০৭-এ এক নমুনা সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষায় ১৭০ জন সীমান্তরেখা বরাবর অঞ্চলে এসে অস্ত্র সমর্পণ করলেও তৎকালীন পিডিপি-কংগ্রেস জোট সরকার এই প্রকল্প তুলে নেয়। তরুণ কাশ্মীরীরা এক-দুজন করে এদেশে চুপচাপ চলে আসছে না এমনটায়। এরা তাদের জীবনের প্রধান অংশ পাকিস্তানের ট্রেনিং ক্যাম্পে কাটিয়েছে। এরা বিমানে পাকিস্তান থেকে উড়ে এসে নেপালে অবতরণ করে সোনালি বর্ডার দিয়ে উপত্যকায় ঢুকে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করছে। কেউবা সমর্পণের আগে পুলিশের হেফাজতে যাচ্ছে।

এদের মধ্যে অনেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ফিরেছে। ১৯৯০ সালের শুরুতে হাজার হাজার তরুণ কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার মোহে পর্বতসঙ্কুল রাস্তা পেরিয়ে অবৈধভাবে পাকিস্তানে যায় কেবল সন্ত্রাস চালাবার তালিম নিতে। তাদের এবার মোহ ভেঙেছে। কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার যে প্রয়াস তা কোনওদিন-ই বাস্তবায়িত হবে না এমন একটা বোধ এইসব বিপথগামীদের মনে তৈরি হয়েছে।

শামিম আহমেদ শেখ বারামুল্লা জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে যখন ফিরে এলো, তখন সে দেখলো গ্রামের আশি বছর বয়সী এক বৃদ্ধা অধীর আগ্রহে বসে রয়েছে তার দুই পুত্র-নাজির, সাবিরের ফেরার প্রতীক্ষায়। সেই ২০ বছর আগে পাকিস্তানের প্ররোচনায় গ্রাম ছেড়ে তারা চলে যায় সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত হতে। আর ফিরে আসেনি তারা।

পাকিস্তানের ফাঁদে পা দিয়ে বহু যুবক যারা কাশ্মীর ছেড়ে পাকিস্তানে গিয়ে বিষময় অভিজ্ঞতা নিয়ে এদেশে ফিরে এসেছে এমনই একজন এনায়েতুল্লা কাজী। সে বলেছে যে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তার জীবন এমন দুর্বিসহ হয়ে গেছিল যে, একসময় আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এরপর তার বাবার প্রচেষ্টায় এদেশে তার পুনর্বাসন হয়েছে।

কথা হলো, যেসব যুবকরা একদা জঙ্গি প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তানে গিয়েছিল এবং এখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে বাতিলের দলে পড়ে আবার ফিরতে চাইছে, তাদের ভারত-বিরোধী মানসিকতার বদল হয়েছে কি? পাকিস্তান নিজেদের মুখ বাঁচাতে তাদের ফেরার সুযোগ দেবে কিনা এটা তাদের ব্যাপার, কিন্তু আমরা এই বিশ্বাসঘাতকদের ফিরতে দেব কি? নাকি, মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখতে জঙ্গি কাসভকে যেমন জামাই আদরে রেখেছি, তেমনি এদেরকেও জামাই আদরে আবার ডেকে আনবো? ●

Swastika RNI No. 5257/57
24 January - 2011, **Republic Day Spl.**

Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

प्रमुख उपलब्धियाँ

अटल आदर्श ग्राम योजना: गांवों की बदलेगी तस्वीर

- गांवों के सुनियोजित विकास के लिए अटल आदर्श ग्राम योजना शुरू।
- प्रथम चरण में 670 न्याय पंचायत मुख्यालयों का विकास केन्द्र के रूप में चयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर इन गांवों को आदर्श गांव बनाया जायेगा।

ऊर्जा: हर घर होगा रोशन

- राज्य में चिन्हित 25,000 मेगावाट जल-विद्युत क्षमता के सापेक्ष अब तक 3146 मेगावाट विद्युत उत्पान क्षमता सृजित।
- 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले 31 नगरों में विद्युत वितरण सम्बन्धी सुधार कार्य प्रस्तावित।

संस्कृत : द्वितीय राजभाषा

- संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य।
- संस्कृत शिक्षकों को भी राजकीय शिक्षकों के समान सुविधाएं।

108 आपातकालीन सेवा : राज्य के लिए संजीवनी

- पं. दीन दयाल उपाध्याय देवभूमि 108 आपातकालीन सेवा बनी जीवनदायिनी।
- एक लाख 25 हजार मां और बच्चों को प्रसव के दौरान सहायता। चलती एम्बुलेंस में 1525 बच्चों का जन्म बना एक नया कीर्तिमान।
- 108 सेवा को राज्य महिला आयोग से जोड़ा गया। इससे महिला उत्पीड़न रोकने में मदद।

आशीर्वाद योजना : युवाओं के लिए नई शुरुआत

- राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखण्ड में स्थापित बड़े औद्योगिक समूह युवकों को प्रशिक्षण देकर नौकरी भी दे रहे हैं।
- उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से चयनित गरीब प्रतिभाशाली 1000 छात्रों को विश्व स्तरीय चार वर्षीय मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण अशोक लीलैण्ड के प्लांट में दिया जा रहा है।

महिला सशक्तीकरण : मातृशक्ति का सम्मान

- बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था। साथ ही पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण।
- बीपीएल परिवारों की कन्याओं के लिए नन्दा देवी कन्या योजना शुरू, जिसमें 5000 रुपये की धनराशि एफ.डी.के रूप में देने की व्यवस्था।
- गौरी देवी कन्या धन योजना शुरू, जिसमें बीपीएल परिवारों की इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को २५ हजार रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र देने की व्यवस्था।

समाज के सभी वर्गों का कल्याण

- सभी पात्र लोगों को वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन देने का निर्णय।
- एक ही परिवार में पति-पत्नी को भी पेंशन योजनाओं का लाभ।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
१२, ई.सी. रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित

विकास की अनुपम पहल

प्रिय भाइयों एवं बहिनों,

देवभूमि उत्तराखण्ड महान सनातन संस्कृति की जनक रही है, इस देवभूमि ने देश एवं दुनिया को वेद, पुराण, उपनिषद, आध्यात्मिक ज्ञान तथा आयुर्विज्ञान सहित भारत को विश्वगुरु का गौरव दिलाया है।

मैं इस प्रदेश के समग्र विकास हेतु आप सभी लोगों द्वारा दिए जा रहे अतुल्य सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस सदी के पहले महाकुम्भ में देश तथा पूरी दुनिया से आये करोड़ों श्रद्धालुओं का इस महाकुम्भ के सफल आयोजन पर हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य बनाने में आपका सहयोग प्राप्त होगा।

आइये धरती का स्वर्ग, देवभूमि उत्तराखण्ड की प्रगति के लिए हम सब मिलकर कदम बढ़ायें......

(रमेश पोखरियाल 'निशंक')